মেয়েলি

ব্রত ও কথা.

অর্থাৎ

পূর্ব্ববঙ্গের মেয়েদিগের-প্রচলিত কতিপয় ব্রতকথার

বিবরণ.

শ্রীপারমেশপ্রসন্ন রায়, বি[illegible]ত্র.

সঙ্কলিত.

প্রকাশক

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

বেঙ্গল মেডিকাল লাইব্রেরী, ২০১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,

কলিকাতা

মূল্য ।০ আনা মাত্র.

বাল্য-সুহৃদ্

অগ্রজপ্রতিম

"বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" রচয়িতা

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন

মহাশয়ের করকমলে

প্রদত্ত হইল।

মুখবন্ধ

পল্লীগ্রামের রমণী সমাজে বহুবিধ বারব্রত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। তাহার অধিকাংশ সম্পূর্ণ যোষিৎ-প্রচলিত। শাস্ত্র দ্বারা প্রচারিত নয় বলিয়া মেয়েলি ব্রতগুলি দেশভেদে নানা প্রকার। পশ্চিম বঙ্গের কএকখানি ব্রত-পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে পূর্ব্ববঙ্গের বিশেষতঃ পশ্চিম-ঢাকা অঞ্চলের ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ সমাজে প্রচলিত কতিপয় ব্রতের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইল.

শিক্ষিত সমাজের অনেকেই অন্তঃপুরের বারব্রত ও অন্যান্য ক্রিয়াকলাপের প্রতি অবজ্ঞা-মিশ্রিত কৃপা কটাক্ষপাত করিয়া থাকেন। কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে সম্প্রতি অন্তর্দৃষ্টির কাল উপস্থিত। সেই ভরসায়, এবং পূজনীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের উৎসাহ বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া, বাহ্যশোভা-বিবর্জ্জিত এই ক্ষুদ্র পুস্তক জনসমাজে প্রচার করিতে সাহসী হইলাম.

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কৃপা পূর্ব্বক যে অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল.

"শ্রীযুক্ত পরমেশপ্রসন্ন রায় মহাশয় সঙ্কলিত 'মেয়েলি ব্রত ও কথা'র মুদ্রিতাংশ প্রাপ্ত হইয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিলাম।

বহুদিন হইল সাধনা পত্রিকায় বাংলার এই সকল গ্রাম্য সাহিত্য প্রকাশের জন্য উদ্যোগী ছিলাম। তখন এগুলিকে তুচ্ছ ও লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবার অযোগ্য বলিয়া অনেকেই অনাদর করিতেন। এই সাহিত্য যে স্বতঃস্ফূর্ত নদীর ধারার মত সুচিরকাল হইতে বাংলার পল্লী-গৃহের দ্বারে দ্বারে প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে, শিক্ষা এবং আনন্দ ঘরে ঘরে বহন করিয়া দিবার এমন সহজবিহিত, সুন্দর, এমন চিরন্তন ব্যবস্থা যে আর কিছুই হইতে পারে না, এই সাহিত্যের মধ্যেই আমাদের পল্লীজীবন-যাত্রার সরল মূলনীতিগুলি যে নানা আকারে সন্নিবেশিত হইয়া আছে এবং কালের পরিবর্ত্তন বশতঃ এগুলি বিলুপ্ত হইয়া গেলে দেশের পুরাবৃত্তের একটী প্রধান উপকরণ নষ্ট হইয়া যাইবে—স্বদেশের প্রতি একদা ঔদাসিন্য বশতঃ একথা তখন কেহ চিন্তা করিতেন না। এখন যে আমাদের সেই দুর্দ্দিনের অবসান হইয়াছে, দেশকে প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করিবার জন্য আমাদের হৃদয়ে আগ্রহ জন্মিয়াছে, বর্ত্তমান গ্রন্থ তাহারই সূচনা করিতেছে। আর একখানি ব্রত কথার সংগ্রহ অল্প দিন হইল প্রকাশিত হইয়াছে; কিন্তু তাহাতে কথাগুলি পুঁথির ভাষায় লিখিত হওয়ায় তাহার রস নষ্ট হইয়াছে। বর্ত্তমান গ্রন্থে সেরূপ নিষ্ঠুরভাবে বিশুদ্ধি সাধনের চেষ্টা হয় নাই দেখিয়া আশ্বস্ত হইয়াছি।

আশাকরি গ্রন্থকারের সংগ্রহ অধ্যবসায় পাঠক-দিগের নিকট হইতে সম্যাদর লাভ করিয়া স্বদেশের অন্তঃপুরে নূতন নূতন সন্ধান ও আবিষ্কারে সার্থক হউক।"

শিক্ষা ও সংসর্গ দোষে পল্লীগ্রামের ব্রতাচরণ ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। দোল দুর্গোৎসব প্রভৃতি ব্যয়সাধ্য ব্যাপার প্রতিগৃহে অনুষ্ঠিত হয় না। পারিবারিক ক্রিয়াকাণ্ড প্রতিনিয়ত সংঘটিত হয় না। অপিচ, সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তিগণ সহরে বাস করেন এবং সহরেই তাঁহাদের বিবাহোৎসব সম্পন্ন হয়। এমত অবস্থায় বারব্রত ও পার্ব্বণাদি বিদূরিত হইলে পল্লীগ্রামের বালক বালিকাদের জীবন নীরস ও নিরানন্দময় হইয়া উঠিবে। বারব্রত বর্জ্জন করিলে হিন্দুগৃহে একাদশীর নিরম্বু উপবাস ব্যতীত আর কি ধর্ম্মানুষ্ঠান রহিয়া যাইবে তাহাও ভাবিবার বিষয়.

ব্রতনিয়ম ও উপবাস অবলম্বনে হিন্দু রমণীগণ শৈশব হইতেই গুরুভক্তি, ধর্ম্মে বিশ্বাস, গৃহধর্ম্মে আস্থা ও ইন্দ্রিয় সংযম প্রভৃতি সংগুণ শিক্ষা ও অভ্যাস করিয়া থাকেন। অধুনা ইউরোপে যেরূপ কিণ্ডার-গার্টেন প্রণালী দ্বারা বিদ্যাশিক্ষাদানের প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, আমাদের দেশে সেইরূপ কৌশলে বালিকাগণ স্মরণাতীত কাল হইতেই "বারব্রত" পদ্ধতিক্রমে ধর্ম্মনীতি শিক্ষা-

লাভ করিয়া আসিতেছে। এইরূপ অপূর্ব্ব শিক্ষা-রীতির গুণেই আমাদের সংসার এখনও এত সুধাময়। এতৎসম্বন্ধে স্বনামধন্যা মার্কিণ-মহিলা "ভগিনী নিবেদিতা" The Modern Review নামক মাসিক পত্রে কিয়দ্দিন হইল এক সারগর্ভ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহা হইতে কতিপয় ছত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল.

"Great men work out knowledge, and give it to the community. Thus each civilisation becomes distinguished by its characteristic institutions. Nothing could be more perfect educationally than the *bratas* which Hindu society has preserved and hands to its children in each generation, as perfect lessons in worship, so in the practice of social relationships, or in manners. Some of these *bratas*—like that which teaches the service of the cow, or the sowing of seeds, or some which seem to set out on the elements of geography and astronomy—have an air of desiring to impart which we now distinguish as secular knowledge. They appear, in fact, like surviving fragments of an old educational scheme. But for the most part, they constitute a training in religious ideas and religious feelings. As such their perfection

is startling. They combine practice, story, game, and object with a precision that no Indian can appreciate or enjoy as can the European familiar with modern educational speculation. India has, in these, done on the religious and social plane, what Europe is trying, in the Kindergarten, to do on the scientific. When we have understood the *bratas*, we cease to wonder at the delicate grace and passivity of the Oriental woman."

(Sister Nivedita in an article 'The place of the Kindergarten in Indian schools' in *The Modern Review*, August 1908.)

অতঃপর, আমাদের অন্তঃপুরের বারব্রতাদি সম্বন্ধে যাঁহারা অযথা নিন্দাবাদ করেন, এই 'মুখবন্ধে' রবিবাবুর এবং মার্কিণ মহিলার মন্তব্য পাঠ করিয়া তাঁহাদের মধ্যে অন্ততঃ দুই এক জনেরও মুখ বন্ধ হইতে পারে এরূপ আশা করা বোধ হয় নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না.

ময়মনসিংহ,
ভাদ্র, ১৩১৫.

সূচী.

মঙ্গলচণ্ডীর "শেখর" বা অর্ঘ্য।

মেয়েলি ব্রত ও কথা

—
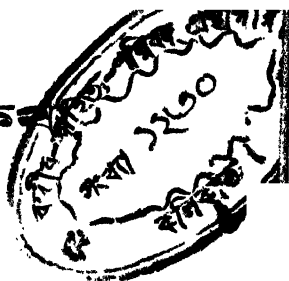
হরিষ-মঙ্গলচণ্ডী ব্রত.

যোষিৎ প্রচলিত বার-ব্রতের মধ্যে 'মঙ্গলচণ্ডী' সর্ব্বপ্রধান। পারিবারিক মঙ্গলকামনা করিয়া ভগবতী চণ্ডিকা দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করাই এই ব্রতের মুখ্য উদ্দেশ্য। মঙ্গলচণ্ডী ব্রত এতদ্দেশে তিন প্রকার প্রচলিত। হরিষ-মঙ্গল, জয়-মঙ্গল ও সঙ্কট-মঙ্গল.

বৈশাখ মাসে প্রতি মঙ্গলবারে হরিষ-মঙ্গলচণ্ডী ব্রত করা কর্ত্তব্য। কুমারী, সধবা, বিধবা (কচিৎ পুরুষদেরও) সকলেরই এই ব্রতে অধিকার আছে। প্রত্যেক পরিবারে অন্ততঃ একজন মহিলা এই ব্রত নিয়ম পালন করিয়া থাকেন। ব্রতকথা শ্রবণের পর দধি দুগ্ধ ফল মূলাদি পান-ভোজন করা যায়; অন্নাহার নিষেধ.

পুরোহিত পূর্ব্বাহ্নে পূজা করিবেন। ধ্যান যথা;

যৈষা ললিতকান্তাখ্যা দেবী মঙ্গলচণ্ডিকা।
বরদাভয়হস্তা চ দ্বিভুজা গৌরদেহিকা॥
রক্তপদ্মাসনস্থা চ মুকুটোজ্জ্বলমণ্ডিতা।
রক্তকৌষেয়বসনা স্মিতবক্ত্রা শুভাননা।
নবযৌবনসম্পন্না চার্ব্বঙ্গী ললিত-প্রভা॥

সর্ব্ববিধ মঙ্গলচণ্ডী ব্রতেই অর্ঘ্য বা চলিত কথায় "শেখর" আবশ্যক। আটটী অখণ্ড আতপতণ্ডুল নখ দ্বারা খুঁটিয়া লইবে। তৎসঙ্গে আট গাছি দুর্ব্বা লইয়া কলা-পাতা দ্বারা জড়াইয়া "শেখর" নির্ম্মাণ করিতে হয়। দুই অঙ্গুলি আন্দাজ পরিসর কলা-পাতা ছিঁড়িয়া লইবে। চাল কয়টী ও দুর্ব্বাগুলির বৃন্তাংশ ভিতরে রাখিয়া, পাতাটী সমবাহু ত্রিভুজের আকারে এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত উপর্য্যুপরি ভাঁজ করিবে। শেষ প্রান্ত সম্মুখের শেষ ভাঁজে গুজিয়া দিবে। দুর্ব্বা বাহিরে ঊর্দ্ধ কোণে লক্ষিত থাকিবে। সংকটমঙ্গলচণ্ডী ব্রতে কলাপাতার পরিবর্ত্তে ক্ষুদ্র রেসম-বস্ত্র খণ্ড দ্বারা অর্ঘ্য বাঁধিতে হয়.

যত জন ব্রত করিবেন ততটী অর্ঘ্য চাই। উহার সম্মুখে পাতার উপর সিন্দূর লেপন. করিবে। পূজান্তে গৃহিণীগণ এই অর্ঘ্য বা "শেখর" যত্নপূর্ব্বক তুলিয়া রাখেন। স্বামী পুত্র কন্যা প্রভৃতি স্বজনগণের বিদেশ যাত্রা কালে এই মঙ্গল "শেখর" মস্তকে স্পর্শ করিয়া "যাত্রা" করিতে হয়.

পুরোহিত পূজা করিয়া গেলে ব্রতচারিণীগণ স্নানান্তে শুদ্ধবাস পরিধান পূর্ব্বক ভক্তি সহকারে "কথা" শ্রবণ করিবেন। তজ্জন্য একাধিক বাড়ীর মেয়েরা এক স্থানে সমবেত হইতে পারেন। সকলেই হাতে এক একটী শেখর লইয়া উপবেশন করিবেন। একজন বর্ষীয়সী রমণী কথা বলিবেন। যদি অনিবার্য্য কারণে (সুপ্তোত্থিত শিশুর ক্রন্দন ইত্যাদি) কাহাকেও কথা শ্রবণ শেষ না হইতেই অন্যত্র চলিয়া যাইতে হয় তবে তাঁহাকে প্রতিনিধিস্বরূপ ভূমিতলে একটী আঁচড় কাটিয়া রাখিয়া যাইতে হইবে। সর্ব্ববিধ ব্রত কথা শ্রবণেরই এই নিয়ম। অন্যান্য ব্রতে

বিশেষ বিধি না থাকিলে একটী পুষ্প হাতে লইয়া কথা শ্রবণ করিতে হয়। রিক্তহস্তে কথা শ্রবণ করিতে নাই.

হরিষ-মঙ্গলচণ্ডী ব্রত কথা.

এক ছিলেন বামুন ঠাক্‌রণ, আর ছিলেন গয়লার মেয়ে। তাঁরা দু'জনে 'সই' পাতিয়েছিলেন। ব্রাহ্মণী বৈশাখ মাসে মঙ্গলবারে হরিষমঙ্গলচণ্ডী ব্রত কোর্‌তেন। গয়লার মেয়ে বল্লেন, সই, এ ব্রত কল্লে কি হয়? "এ ব্রত কল্লে চিরকাল সুখে যায়"। গয়লার মেয়ে বল্লেন, তবে আমিও এ ব্রত কর্‌বো, ব্রতের নিয়ম ব'লে দাও। বামুন ঠাক্‌রণ বল্লেন, তুমি গয়লার মেয়ে, ব্রতের নিয়ম পালন কর্‌তে পার্‌বে না; তোমার ব্রত ক'রে কাজ নেই। গয়লার মেয়ে বল্লেন, তা হবে না, আমি অবিশ্যি কর্‌বো। তারপর তিনিও বৈশাখ মাসে মঙ্গলবারে ব্রত আরম্ভ কল্লেন। দু' একবার ব্রত করতেই মা মঙ্গলচণ্ডীর কৃপায় গয়লার মেয়ের সংসার ধন জনে ভরিয়া গেল। সুখের সীমা রহিল না। হঠাৎ এত সুখ তাঁহার সহ্য হলো না। তিনি কাঁদিবার জন্য আকুল হ'লেন। বামুন ঠাক্‌রুণের কাছে গিয়ে বল্লেন, সই, "সে-জনের" * (অর্থাৎ আমার) বড় কাঁদতে ইচ্ছে হচ্চে। ব্রাহ্মণী উত্তর কল্লেন, আমি তো তোমায় তখনি বলেছি এ ব্রত কল্লে কখনও চো'কের জল পড়ে না। গয়লার মেয়ে কিছুতেই বোঝ মানলেন না, সুখে যেন অস্থির হয়ে উঠলেন। তখন বামুন ঠাক্‌রুণ বল্লেন, তোমার যদি কাঁদতে এত

---

* উক্তিটি অকল্যাণ সূচক বলিয়া কথক ঠাকুরাণী এস্থলে উত্তম পুরুষের সর্ব্বনাম ব্যবহার করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন.

সাধ হয়ে থাকে তবে এক কাজ কর। গেরস্তদের ক্ষেতে লাউ কুমড়ো আছে তাই তুমি লুকিয়ে তু'লে নাও গে; তারা তোমায় গালাগাল দেবে, যা না বলবার তাই বলবে, তোমার মনে তখন দুঃখ হবে, তাহ'লে তুমি একটু কাঁদতে পারবে। তাই শুনে গয়লার মেয়ে লাউ কুমড়ো তুলতে গেলেন। কিন্তু ব্রতের পুণ্যিতে তাঁর শরীর শুদ্ধ হয়ে গেছে; তাঁর হাত লাগতেই ক্ষেত লাউ কুমড়োতে ভ'রে গেল। গৃহস্থেরা অবাক্ হ'য়ে ভাবতে লাগলো, ইনি তো সামান্য মেয়ে নন্, স্বয়ং লক্ষ্মী ঠাকরুণ! তারপর তারা সকলে গয়লার মেয়ের বাড়ীতে সব লাউ তরকারী ব'য়ে দিয়ে এল.

গয়লার মেয়ের কান্না হ'লো না। তিনি সইয়ের কাছে গেলেন। গিয়ে বল্লেন সই, "সেজন" (আমি) কাঁদতে পাল্লে না। ব্রাহ্মণী বল্লেন, তোমার যদি কাঁদ্‌তে এতই সাধ হয়ে থাকে, তবে আর এক কাজ কর। রাজবাড়ীর হাতী ম'রে পড়ে আছে, তুমি ঐ হাতীর শোকে হাতীর গলা ধরে মরা-কান্না কাঁদ গে। গয়লার মেয়ে তাই কল্লেন। কিন্তু ব্রতের পুণ্যিতে তাঁর শরীর শুদ্ধ হ'য়ে গেছে; তাঁর হাত লাগতেই বারো বছরের মরা হাতী বেঁচে উঠলো। সকলে এই তাজ্জব দেখে বলাবলি করতে লাগলো, ইনি তো সামান্য মেয়ে নন, স্বয়ং লক্ষ্মী ঠাকরুণ! রাজা এসে হাতী ঘোড়া সোণা রূপো সওগাদ দিয়ে গয়লার মেয়ের বাড়ীঘর ভ'রে ফেল্লেন.

গয়লার মেয়ের কান্না হলো না। সবই উল্‌টো হলো! তিনি আবার সইয়ের কাছে গেলেন। গিয়ে বল্লেন, সই, সুখ আরো বেড়ে যাচ্ছে; সেই উপায় করো, যাতে "সেজন" প্রাণ

ভ'য়ে কেঁদে একটু খানি সোয়াস্তি পায়। ব্রাহ্মণী বল্লেন, তোমার যদি কাঁদ্‌তে এতই সাধ হ'য়ে থাকে তবে আর এক কাজ কর। সাপের বিষ মেখে লাড়ু তয়ের ক'রে বিদেশে তোমার বড় ছেলের কাছে পাঠিয়ে দাও। গয়লার মেয়ে তাই কল্লেন। চাকর লাড়ুর হাঁড়ি মাথায় করিয়া চলিল। বৈশাখ মাস, দারুণ রোদ; লোকটী এক পুকুর পাড়ে হাঁড়ি রাখিয়া স্নান করিতে নামিল। তখন মা মঙ্গল চণ্ডী মনে ভাবলেন, আমার ভক্তের দুর্ম্মতি হয়েছে, তবে যদ্দিন আমার ব্রত করবে তদ্দিন ওকে চোকের জল ফেল্‌তে দেবো না। এই ভেবে মা চণ্ডী শ্রীমুখের অমৃত দিয়ে বিষের লাড়ু অমৃতের লাড়ু করে দিলেন। চাকর হাঁড়ি তুলিয়া আবার হাঁটিতে হাঁটিতে গয়লার ছেলের কাছে পঁহুছিল। ছেলে লাড়ু খেয়ে বল্লে, আহা মা এমন খাবার তৈরি করতে পারেন তা' তো আগে কোন দিনও জানতুম না। মা'কে বলিস্ তিনি আরো এমনি লাড়ু যেন পাঠিয়ে দেন। এই ব'লে চাকরকে অনেক বকশীশ কল্লেন। এদিকে বাড়ীতে গয়লার মেয়ে এলোচুলে উচুনীচু স্থানে দাঁড়িয়ে প্রস্তুত হয়ে আছেন, যেই কুসংবাদটী পাবেন আর অমনি চিংপাত হয়ে ছেলের শোকে প্রাণ ভ'রে কাঁদবেন। এমন সময়ে চাকরটী ফিরে এসে গয়লা-গিন্নিকে অমন ব্যস্ত-সমস্ত দেখে বল্লে, মা ঠাকরুণ, তুমি এত উতলা হয়েচ কেন? বড় বাবু ভাল আছেন, আর তিনি এবার লাড়ু খেয়ে খুব সুখ্যাত করেছেন; আর আমাকেও কত বকশীশ দিয়েছেন.

গয়লার মেয়ের এবারও কান্না হলো না। তিনি ছুটে গিয়ে সইয়ের কাছে বল্লে সই কাঁদতে না পারলে "সেকল" আর

বাঁচবে না। বামুন ঠাকুরণ বল্লেন, আচ্ছা আর এক কাজ কর। এবার আদৎ সাপ পাঠাতে হবে। এবারে তোমার মেয়ের বাড়ী তত্ত্ব পাঠিয়ে দাও। সন্দেশের হাঁড়িতে সন্দেশ না দিয়ে ছুটো কেউটে সাপ দাও। তোমার ছোট ছেলে মাথায় ক'রে তত্ত্ব নিয়ে যাক্। হয়, রাস্তায় তোমার ছেলের, নইলে মেয়ের বাড়ীতে কারুর একটা ভাল-মন্দ অবিশ্যি ঘটিবে। তখন তুমি যা হয় করিও। গয়লার মেয়ে তাই কল্লেন। তাঁর ছোট ছেলের মাথায় হাঁড়ি তুলে দিলেন। বৈশাখ মাস দারুণ রোদ; এক পুকুর-পাড়ে হাঁড়ি রাখিয়া গয়লার ছেলে স্নান করিতে নামিল। তখন মা মঙ্গল চণ্ডী মনে ভাবলেন, আমার ভক্তের দুর্ম্মতি হয়েছে। তবে যদ্দিন আমার ব্রত করবে তদ্দিন ওকে চোকের জল কিছুতেই ফেলতে দেবো না। এই ভেবে তিনি সাপ দূর ক'রে সমস্ত হাঁড়ি সোণা দিয়ে পুরে দিলেন। ছেলেটীর বড় খিদে পেয়েছিল। একটু সন্দেশ নিয়ে জলযোগ করতে দোষ কি, এই ভেবে সে হাঁড়ি খুলে দেখে, সবই সোণা! আশ্চর্য্য হয়ে সে মনে কল্লে, মা দিদিকে গহনার জন্যে এত সোণা দিয়েছেন তা ভালোই; তবে কুটুম্ব বাড়ী যাচ্চি, খাবার সামগ্রী না নিয়ে যাওয়াটা ভাল নয়। এই ভেবে একটু সোণা তুলে নিয়ে বাজার থেকে দই, সন্দেশ, মাছ, দুধ, পঞ্চাশ জন মুটের মাথায় দিয়ে ভগিনীর বাড়ী গেল। কুটুম্বেরা এত সোণা ও ভুরের জিনিস দেখে আশ্চর্য্য হয়ে ছেলেটীর খুব সমাদর কল্লে। এদিকে গয়লার গিন্নি এলো চুলে উচুনীচু স্থানে দাঁড়িয়ে প্রস্তুত হয়ে আছেন, যেই তাঁর ছোট ছেলের, মেয়ের কি জামাইয়ের কুসংবাদটী পাবেন আর অমনি চিৎপাত হয়ে শোকে প্রাণ

ভ'রে কাঁদবেন। এমন সময়ে ছেলে উপস্থিত। মা'কে ব্যস্ত সমস্ত দেখে সে বল্লে, মা, তুমি এত উতলা হয়েছ কেন? দিদি-দের বাড়ীতে সব ভাল। তাঁরা তোমার সোণা পেয়ে তোমার কত সুখ্যাত করেছেন, আমিও বাজার থেকে দই সন্দেশ মাছ দুধ কিনে দিয়েছি.

গয়লার মেয়ের কান্না কিছুতেই হলো না। তিনি আবার সই-য়ের কাছে ছুটে গেলেন। গিয়ে বল্লেন, সই কাঁদতে না পেরে "সেজন" বুঝি মারা গেল! বামুন ঠাকরুণ মহা বিরক্ত হলেন। খানিক ভেবে চিন্তে বল্লেন, হাঁ, এবার ঠিক হয়েছে আর তোমার ভাবনা নেই। এক কাজ কর। আসছে কাল মঙ্গলবার। এবারে তুমি আর ব্রত করোনা। গয়লার মেয়ে তাই কল্লেন। পরদিন মঙ্গলবার তিনি ব্রত উপোস বন্ধ ক'রে সকাল সকাল পঞ্চাশ ব্যঞ্জন ভাত আহার কল্লেন। এবার সত্যি সত্যিই তাঁর দুর্ম্মতি হলো। মা মঙ্গলচণ্ডী বিরূপ হলেন। সেই দণ্ডে তাঁর হাতীশালে হাতী ম'লো, ঘোড়াশালে ঘোড়া ম'লো, লোকজন, ছেলে মেয়ে জামাই যে যেখানে ছিল সব ম'রে গেল। তখন তিনি হাহাকার ক'রে দিবা রাত্তির কাঁদতে লাগলেন। তাঁর কান্নার রোল শুনে কেউ আর তিষ্ঠাতে পারে না। এই ভাবে দু'চার দিন কেটে গেল। কেঁদে কেঁদে হয়রান হয়ে তিনি আবার সইয়ের কাছে গিয়ে বল্লেন, সই "সেজন" আর কাঁদতে পারে না। ব্রাহ্মণী বল্লেন, তা আমি কি করবো। তোমার এত দিনের সাধ, প্রাণ ভ'রে কাঁদো। শোকে দুঃখে গয়লার মেয়ের বুক যেন ফেটে যেতে লাগলো। তিনি বামুন ঠাকরুণের পায়ে পড়ে বল্লেন, সই রক্ষে করো, "সেজন"

আর কাঁদতে পারে না, বুক যে ফেটে যাচ্চে। ব্রাহ্মণীর দয়া হ'লো। তিনি বল্লেন, তোমাকে আস্‌ছে মঙ্গলবার পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। তিনি আগেই সব জায়গায় জায়গায় খবর পাঠিয়েছিলেন কেহ যেন মড়া পোড়ায় না, সাবধানে রাখিয়া দেয়। তারপর মঙ্গলবার ব্রাহ্মণীর উপদেশ মত গয়লার মেয়ে ষোড়শোপচারে ভক্তি ক'রে মহা ধুমধামে মা মঙ্গল চণ্ডীর ব্রত কল্লেন। পূজার ফুল জল মড়ার উপর ছড়িয়ে দিতেই ছেলে মেয়ে জামাই, লোকজন, হাতী ঘোড়া যে যেখানে ম'রে পড়ে ছিল সব বেঁচে উঠলো। গয়লার মেয়ের আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি আবার সুখে স্বচ্ছন্দে সংসার করিতে লাগিলেন.

এই হরিষ মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত ভক্তি করিয়া যে বৈশাখ মাসে করে সে চিরকাল সুখে থাকে, তাকে চো'কের জল ফেল্তে হয় না। একথা যে বলে, যে শোনে, তার মঙ্গল হয়.

প্রণাম। সর্ব্ব মঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোস্তুতে ॥

জয়-মঙ্গলচণ্ডী ব্রত.

এই ব্রত যে কোন মঙ্গলবারে বার মাস করা যায়। সুগৃহিণী-গণ প্রতি মাসেই একবার নিয়ম পালন করেন। পূজা ও "শেথর" বা অর্ঘ্য নির্ম্মাণ হরিষ মঙ্গল চণ্ডীর ন্যায়। কেবল 'কথা" ভিন্ন। কথাটী সুবিখ্যাত শ্রীমন্ত সওদাগরের উপাখ্যান। কবি-কঙ্কণ মুকুন্দরাম রচিত চণ্ডীকাব্যে উক্ত আখ্যায়িকা সকলেই

অবগত আছেন। নিম্নোক্ত ব্রতকথার পাঁচালী এতদ্দেশের রমণী সমাজে অতি সমাদরে গৃহীত হইয়াছে। ইহার রচয়িতার পরিচয় অজ্ঞাত। একস্থলে 'দ্বিজ জনার্দ্দন' ভণিতা আছে। অতি বৃদ্ধা নিরক্ষরা ঠাকুরাণীদের অশুদ্ধ ও অসম্পূর্ণ আবৃত্তি অনুকরণ করিয়া পরবর্ত্তী প্রৌঢ়া বধূগণ স্মৃতি হইতে অনেকাংশ বর্জ্জন করিয়াছেন। অতঃপর নব্যাগণের পয়ার মিলের চেষ্টায় কোন কোন স্থল বিশেষ পরিবর্ত্তিত বা অর্থহীন হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রথম দুই ছত্র অবিকল রক্ষিত হইল। কতিপয় বর্ষিয়সী মহিলা হইতে পাঁচালী সংগ্রহ করিয়া যথাসম্ভব ঐক্য রক্ষা পূর্ব্বক উহা নিম্নে প্রকাশ করা গেল.

জয়-মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত কথা.

নমো আদি দেব নারায়ণ বন্দি সঙ্কট চরণ।
বন্দিয়া মঙ্গলচণ্ডী করি শুভক্ষণ॥
মঙ্গল চণ্ডিকার পদে কোটী নমস্কার।
মহামায়া রূপে দেবী মোহিলা সংসার॥
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর দেবী গৌরবর্ণ ধলা।
রক্তবস্ত্র পরিধান সুবর্ণের মালা॥
স্থানে স্থানে শোভা করে দিব্য অলঙ্কার।
গলে তার শোভা করে গজমতি হার॥
দুই হস্তে শোভা করে সোণার কেয়ুর।
দু' চরণে শোভা করে সোণার নূপুর॥
অভয়া বরদ-হস্তা দেবী মহামায়া।
অনুগত জন প্রতি সদা তাঁর দয়া॥

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর দেব সুরপতি।
চরণে ধরিয়া তাঁর করে নমাস্তুতি॥
সহস্র বদনে যাঁর কইতে নারে গুণ।
কি আর বর্ণিব আমি, নাহি কোন গুণ॥
পূজহ মঙ্গলচণ্ডী জগতেরি মাতা।
দুর্গতি নাশিনী দেবী সর্ব্বসুখ দাতা॥
পৃথিবীতে আছে এক উজানি নগরী।
অতি মনোরম্য স্থান যেন সুরপুরী॥
বিক্রমকেশরী নামে তথা নরপতি।
সেই দেশে বাস করে সাধু ধনপতি॥
লহনা খুল্লনা তাঁর দুইটী যুবতী।
কর্ম্ম অনুসারে সাধু হইল দুর্ম্মতি॥
বিধাতা-নির্ব্বন্ধ তাই সতীন বচনে।
খুল্লনাকে নিয়োজিল ছাগল রক্ষণে॥
ছাগল হারায়ে নারী দৈবের কারণ।
ব্যাকুল হইয়া হায় ভ্রমে বনে বন॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে বালা হইল মূর্চ্ছিত।
জয়কার হুলুধ্বনি শুনে আচম্বিত॥
সেই দিকে যান সতী প্রবেশিয়া বন।
সরোবর তীরে গিয়া দেখে নারিগণ॥
পঞ্চবর্ণ গুঁড়ি দিয়া করেছে মণ্ডল।
মধ্যেতে শোভিছে ঘট পূর্ণ তাহে জল॥
অষ্ট গাছি দূর্ব্বা আর অষ্টটী তণ্ডুল।
ধুপ দীপ ফুল ফল নৈবেদ্য বহুল॥

তাহা দেখি ভক্তিভরে খুলনা সুন্দরী।
সবিনয়ে জিজ্ঞাসেন কর যোড় করি ॥
কিং ব্রত করহ সবে কিবা এর ফল।
মোর স্থানে কহ সবে বিধান সকল ॥
খুলনা কহিল যদি এতেক বচন।
সাদরে কহিছে তবে যত নারিগণ ॥
মঙ্গল চণ্ডিকা ব্রত জানিবে ইহারে।
যাহা বাঞ্ছা তাহা লাভ চণ্ডিকার বরে ॥
গন্ধপুষ্প ধুপ দীপ নানা উপচার।
জলেতে পূর্ণিত ঘট প্রতি মঙ্গলবার ॥
ছাগ মহিষ নৈবেদ্য মঙ্গল আচারে।
নানা পুষ্প দিয়া পূজা বিহিত প্রকারে ॥
এই তো মঙ্গলচণ্ডী পূজা করি সবে।
ব্রত কথা বলি তোমা শুন ভক্তিভাবে ॥
কলিঙ্গ দেশের রাজা সহস্রাক্ষ নাম।
প্রজার পালন করে গুণে অনুপম ॥
কালকেতু নামে ব্যাধ সেই দেশে বসে।
নিত্য মৃগ বধ করি পরিজন পোষে ॥
ধনুকে জুড়িয়া বাণ কাঁধে লয় বাড়ি।
ব্যাধেরে দেখিয়া মৃগ করে দৌড়াদৌড়ি ॥
পাছু পাছু ধায় মৃগ মারিবার আশে।
পালায় বনের পশু প্রাণের তরাসে ॥
পাইয়া প্রাণের ভয় যত মৃগগণ।
মঙ্গলচণ্ডীর পদ করিল স্মরণ ॥

কাতরে করুণাময়ী দারিদ্র্য নাশিনী।
সুবর্ণ গোধিকা রূপ ধরেন তারিণী॥
মৃগ না পাইয়া ব্যাধ গোধিকা লইল।
ত্বরিত গমনে তবে গৃহেতে চলিল॥
যেই মাত্র ঘরে নিল সুবর্ণ গোধিকা।
পরমা সুন্দরী রূপ ধরেন চণ্ডিকা॥
বিস্ময় মানিয়া তবে ব্যাধ কালকেতু।
ধরণীর মুখে চেয়ে জিজ্ঞাসিল হেতু॥
দিব্য রূপ দেখি ভাগ্যে নাহি সরে বাণী।
ভক্তিভরে জিজ্ঞাসিল কাহার রমণী॥
সদয় মঙ্গলচণ্ডী হৈলা ততক্ষণ।
ব্যাধকে বলিলা দেবী কোমল বচন॥
শুন ওহে কালকেতু ব্যাধের নন্দন।
ধন দিতে তোমা আমি করেছি মনন॥
সুবর্ণ কাঞ্চন লও এই পঞ্চ ঘট।
অসময়ে স্মরো আমি আসিব নিকট॥
আর পশু না বধিবে ব্যাধের নন্দন।
এ কারণে তোমা আমি দিনু এই ধন॥
এতেক বলিয়া চণ্ডী হৈলা অন্তর্ধান।
কৃতার্থ হইয়া ব্যাধ লভিল গেয়ান॥
ধনের বৃত্তান্ত রাজা পেয়ে চর মুখে।
বিনা অপরাধে ব্যাধে বন্দী করি রাখে॥
কোথা পেলে এত ধন ব্যাধের তনয়।
চোরা মাল সব হবে নাহিক সংশয়॥

কারাগারে পড়ে ব্যাধ কাঁদিতে লাগিল।
বিপদে পড়িয়া চণ্ডী স্মরণ করিল॥
বন্ধনেতে জড় জড় না চিনি আপন পর
বিনা দোষে কারাগারে হইল মরণ।
কোথা পুত্র পরিবার হায় না দেখিনু আর
কে আর তাদের এবে করিবে রক্ষণ॥
সোণার পুত্তলি ছেলে না তুষিবে আধ বোলে
কামিনী আর হায় না লইলাম কোলে।
কাঁদে ব্যাধ উচ্চৈঃস্বরে বক্ষে করাঘাত ক'রে
হায় বিধি কিবা তুমি লিখিয়াছ ভালে॥
মারিতাম মৃগগণ পুষিবারে পরিজন
ধন রত্ন পাই তবে চণ্ডিকার বরে।
করিলাম অঙ্গীকার মৃগ না বধিব আর,
ধন রত্ন এবে লয় রাজার ভাণ্ডারে॥
গতি হীন পরিবার কে লবে তাদের ভার
বিপদে পড়েছি চণ্ডী কর মা উদ্ধার।
কহে দ্বিজ জনার্দ্দন শুন ব্যাধ মহাজন
চণ্ডিকা প্রসন্না, শোক করিও না আর॥
কালকেতু-স্তুতি বাক্য করিয়া শ্রবণ।
সদয় মঙ্গলচণ্ডী হইলা তখন॥
কেঁদো না, কেঁদো না ব্যাধ স্থির কর মতি।
এসেছি করিতে আমি তব অব্যাহতি॥
এতেক বলিয়া দেবী গেলা রাজস্থানে।
সহস্রাক্ষ নৃপতিকে কহেন স্বপনে॥

আমার সেবক ব্যাধ শুনহ রাজন।
রজনী প্রভাত মাত্র করিবে মোচন॥
তোমার ভাণ্ডারে তার আনিয়াছ ধন।
দ্বিগুণ করিয়া তাহা করিবে অর্পণ॥
স্বপন দেখিয়া রাজা কম্পিত হৃদয়।
ব্যাধের নিকটে যেয়ে ক্ষমা ভিক্ষা লয়॥
ব্রত কথা শুনি বলে খুল্লনা সুন্দরী।
আজ্ঞা যদি কর তবে আজি ব্রত করি॥
শুনিয়া যুবতিগণ হাসিতে লাগিল।
অষ্ট চা'ল দূর্ব্বা আনি খুল্লনাকে দিল॥
সেই খানে সতী সাধ্বী ব্রত আরম্ভিল।
হারানো ছাগল আসি তখনি জুটিল॥
ব্রতের প্রত্যক্ষ ফলে আনন্দ অপার।
ঘরে এসে ব্রত করে প্রতি মঙ্গলবার॥
সতীনের কোপ গেল দুঃখ গেল দূর।
সুয়ো হ'য়ে খুল্লনার আনন্দ প্রচুর॥
কতদিন বঞ্চিলেন সাধু ধনপতি।
সফরে যাইতে মনে হইল যুকতি॥
ছয় মাস গর্ভবতী খুল্লনা তখন।
স্বামীর চরণে গিয়া করে নিবেদন॥
তুমি তো চলেছ প্রভু বাণিজ্য ব্যাপারে।
তোমার সন্তান আছে আমার উদরে॥
ছয় মাস গর্ভ জানি সাধু ধনপতি।
অভিজ্ঞান পত্র দেন হরষিত মতি॥

তবে সাধু হীরামণি রত্ন জহরতে।
হরিষে ভরেন পোত যত লয় চিতে ॥
ডিঙ্গা অর্ঘ্য দিতে গেল লহনা যুবতী।
খুলনারে না দেখিয়া রুষিলেন অতি ॥
ব্রতে রতা ছিল ঘরে পতিব্রতা সতী।
ভেঙ্গে ফেলে চণ্ডী-ঘট বণিক দুর্ম্মতি ॥
ডিঙ্গা ভাসাইয়া চলে সমুদ্রের ধারে।
গর্জ্জিয়া উঠিল ঢেউ জলের ভিতরে ॥
মঙ্গল-চণ্ডীকে সাধু করে অপমান।
সমুদ্রে ডুবিল তার ডিঙ্গা বার খান ॥
শাল্যবান রাজার রাজ্য অতি ভীতিকর।
সেই দেশে উঠে সাধু হয়ে একেশ্বর ॥
অদ্ভুত দেখিল সাধু সেই দেশে আসি।
এক কন্যা হস্তী গিলে পদ্মপত্রে বসি ॥
আশ্চর্য্য দেখিয়া সাধু কৌতুক হইল মন।
রাজাকে কহেন গিয়া অপূর্ব্ব কথন ॥
সেনা সহ রাজা আসে সাধুর বচনে।
কিছু না দেখিয়া তাঁর ক্রোধ হলো মনে ॥
সাধুকে বাঁধিতে আজ্ঞা করিল তখন।
কারাগারে বন্দী রহে সাধু মহাজন ॥
হেথায় সাধুর ভার্য্যা খুলনা যুবতী।
তার ঘরে হলো পুত্র রূপেতে শ্রীপতি ॥
বাছিয়া রাখিল নাম শ্রীমন্ত কুমার।
নিত্য নিত্য বাড়ে পুত্র যেন চন্দ্রাকার ॥

চারি বর্ষ চারি মাস বয়স হইল।
শুভক্ষণে হাতে খড়ি শ্রীমন্তকে দিল॥
পাঠশালে যায় নিত্য সাধুর নন্দন।
অক্ষর বানান ফলা করে সমাপন॥
একদিন পাঠশালে শ্রীমন্ত কুমার।
কঞ্চির কলম খসি পড়িল তাহার॥
শ্রীমন্ত বলেন সব পড়ুয়ার স্থান।
আমাকে তুলিয়া দাও অই কঞ্চি খান॥
হাসিয়া সকলে বলে দুরক্ষর বাণী।
জারজ কুমার তুমি কে দিবে লেখনী॥
কুবচনে অপমান অন্তরে পাইয়া।
আপন ঘরেতে আসি রহিল শুইয়া॥
মাতা ও বিমাতা এসে জিজ্ঞাসে তখন।
কেন গো শুয়েছ পুত্র না ক'রে ভোজন॥
প্রভাতে রেঁধেছি অন্ন খাওনা আসিয়া।
বড়ই অস্থির মোরা তোমার লাগিয়া॥
শ্রীমন্ত বলেন তবে জননীর স্থানে।
কাহার তনয় আমি কহ শুদ্ধ মনে॥
খুল্লনা করেন তবে সদর্পে উত্তর।
তব পিতা ধনপতি সাধু সদাগর॥
এতেক বলিয়া তবে সেই সাধ্বী সতী।
সাধুর হাতের পত্র দেন শীঘ্রগতি॥
পত্র পাঠে শ্রীমন্তের হরষিত মন।
মাতার চরণ পুত্র করেন বন্দন॥

ভোজন করিয়া তবে করে নিবেদন।
দৈবজ্ঞ আনিয়া মাগো কর শুভক্ষণ ॥
পিতার উদ্দেশে আমি অবশ্য যাইব।
পিতাকে লইয়া আমি দেশেতে ফিরিব ॥
কাঁদিয়া বলেন তবে খুলনা সুন্দরী।
বিদেশে যাইবে পুত্র প্রাণে নাহি ধরি ॥
লহনা বলেন ডাকি মাল্লা মাঝিগণ।
সাজাইয়া নৌকা খানি আন এইক্ষণ ॥
অপুত্রের পুত্র মোদের নির্ধনের ধন।
বিপদে পড়িলে চণ্ডী করিও স্মরণ ॥
অষ্টটি তণ্ডুল দুর্ব্বা আশীষ মাথায়।
অসময়ে চণ্ডী মাতা হইও সহায় ॥
দুই জননীর পদ করিয়া বন্দন।
যাত্রা করিয়া চলে সাধুর নন্দন ॥
একদিন দরিয়ায় ছাড়ে বড় বাও।
মাঝির শকতি নাই রাখিবারে নাও ॥
কাণ্ডারীর কর্ণ ছিঁড়ে, দাঁড়ীদের দণ্ড।
শত শত গুণ ছিঁড়ি হলো খণ্ড খণ্ড ॥
আকাশেতে লাগে ঢেউ নাহি দেখি কূল।
শ্রীমন্ত দেখিয়া তাহা হইল ব্যাকুল ॥
করযোড়ে শ্রীচণ্ডীকে স্মরণ করিল।
যত ছিল ঝড় বৃষ্টি তখনি থামিল ॥
শাল্যবান রাজার রাজ্য অতি ভীতিকর।
সেই দেশে উপনীত শ্রীমন্ত কুঙর ॥

অদ্ভুত দেখেন আহা সেই দেশে আসি।
এক কন্যা হস্তী গিলে পদ্মপত্রে বসি ॥
আশ্চর্য্য দেখিয়া তাঁর কৌতুক হলো মন।
রাজাকে কহেন গিয়া অপূর্ব্ব কথন ॥
সেনাসহ রাজা আসে শ্রীমন্ত বচনে।
কিছু না দেখি রাজার ক্রোধ হলো মনে ॥
এক সাধু ভণ্ড আসি কারাগারে রয়।
শমন সদনে একে পাঠাব নিশ্চয় ॥
শ্রীমন্তে কাটিতে আজ্ঞা করিল তখন।
মশানে শ্রীমন্ত করে চণ্ডিকা স্মরণ ॥
অষ্টটী তণ্ডুল দুর্ব্বা ধরিয়া মাথায়।
রক্ষ রক্ষ ব'লে বন্দী ডাকে চণ্ডিকায় ॥
কালি কালিকে মা! মোক্ষ কামেশ্বরি।
খর খড়্গ করে ধর কালীরূপ ধরি ॥
গণেশ জননী মাগো অগতির গতি।
ঘোরতরা ঘোরহরা ঘুচাও দুর্গতি ॥
ভকারে ভৈরবী দেবী ভৈরব অঙ্গনা।
ঙ সংজ্ঞা হেমাঙ্গিনী পঙ্কজ লোচনা ॥
চতুরে চাতুরী করে শুনগো তারিণী।
ছায়াদানে ত্রাণ কর তাপিত পরাণি ॥
জননী আমার তোমা সেবে চিরকাল।
ঝাপটিয়া রাখ মাগো দাসীর ছাওয়াল ॥
ঞকার যোগিনী রূপী যোগ পরায়ণা।
ঞকার বিরিঞ্চি-বাঞ্ছা কাঞ্চন-বরণা ॥

টলিবে আসন তব টলমল করি।
ঠগের দৌরাত্ম্য শুনি সেবক উপরি ।।
ডরিছে সেবক তব অসুরের ডরে।
ঢাল করবাল মাগো আছে তব করে ।।
ণকার রূপিণী চণ্ডী ণকার গৃহিণী।
ণকার প্রণমি মূর্দ্ধে নমঃ নারায়ণি ।।
তারা মা তারিণী তুমি তরাও বিপদে।
থির কর মতি মোর স্থান দেও পদে ।।
দনুজ দলিনী দুর্গে দীনে দয়াময়ী।
ধরিত্রী ধারণ কর হয়ে দৈত্য জয়ী ।।
নিস্তারিণী রূপে রক্ষা কর গো তারিণী।
নমস্তে শিবের নারী নমো নারায়ণি ।।
পতিত জনের প্রতি পার্ব্বতীর দয়া।
ফলিবে সর্ব্বত্র, যদি দেও পদ ছায়া ।।
বরদা অভয়া দেবী ভকতে বৎসল।
ভয়েতে বিহ্বল আমি চরণ সম্বল ।।
মহিষ মর্দ্দিনী মাতা সর্ব্বাণী সহায়।
মশানে শ্রীমন্ত মাগো সোমরে তোমায় ।।
যোগ-মায়া নমি তোমা করি যোড়কর
রক্তবীজ মহিষাসুর করিছে কাতর ।।
ললজ্জিহ্বা মুক্তকেশী রক্ত কর পান।
বক্ষী বধ করে অদ্য দৈত্য শাল্যবান ।।
শঙ্কর-গৃহিণী শিবে সর্ব্বার্থ সাধিকে।
ষড়ানন-গর্ভা মাতা চার্ব্বঙ্গী চণ্ডিকে ।।

সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে সবার শরণ।
হরের গৃহিণী কর দুষ্কৃতি হরণ ॥
ক্ষমা কর মোক্ষ দেহি অয়ি গিরিসুতে।
ক্ষমস্ব ক্ষেমদে ত্রাহি দুর্গে নমোস্তুতে ॥
চৌত্রিশ অক্ষরে স্তব শুনিয়া তারিণী।
আচম্বিতে উপনীত হইলা তখনি ॥
বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর বেশ ডাঙ্গ বাড়ি হাতে।
শ্রীমন্তকে কোলে করি বসেন সভাতে ॥
কে তোকে কাটিতে পারে কারে তোর ভয়।
তোর মা খুল্লনা আমার সেবক হয়।
স্বপনে রাজাকে দেবী দেন দরশন।
বিস্তর করিলা তারে তর্জ্জন গর্জ্জন ॥
রাজ্য প্রাণ রক্ষা যদি চাহ শাল্যবান।
অর্দ্ধেক রাজত্ব আর কন্যা কর দান ॥
তবে রাজা দেবী বাক্য শিরেতে বন্দিয়া।
অর্দ্ধেক রাজত্ব সহ কন্যা দিল বিয়া ॥
বন্দিশালে রুদ্ধ ছিল যত বন্দিগণ।
কুমারের পুণ্যে সবে হইল মোচন ॥
ধনপতি শ্রীমন্তের হলো পরিচয়।
পিতার চরণে পুত্র দণ্ডবৎ হয় ॥
জামাতা বেহাই প্রতি কহে শাল্যবান।
তোমাদের বাক্য মানি বেদের সমান ॥
সমুদ্রের তীরে পুনঃ করিব গমন।
পদ্মাসনা দেবী যদি দেন দরশন ॥

অদ্ভুত দেখিল তারা আসিয়া তখনি।
কমলে কামিনী বটে গণেশ জননী ॥
কোলে লয়ে গজাননে করেন চুম্বন।
হস্তীভ্রম দূরে গেল, সবিস্ময় মন ॥
ধন রত্ন বধূ লয়ে আনন্দিত মন।
পুত্র সঙ্গে করে সাধু স্বদেশ গমন ॥
ধনপতি বলে শুন শ্রীমন্ত কুমার।
এই স্থানে বার ডিঙ্গা ডুবেছে আমার ॥
মা চণ্ডী বলিয়া যেই স্মরণ করিল।
পণ্যসহ বার ডিঙ্গা ভাসিয়া উঠিল ॥
চারি দিকে পূর্ণ হলো "জয় জয়" রবে।
সেই স্থানে পূজে সাধু মহা-মহোৎসবে ॥
দ্বাদশ বৎসর পরে সাধু সদাগর।
ঘাটে এসে উপনীত লইয়া বহর ॥
পতি পুত্র এলো শুনি পাইয়া পিরীতি।
লহনা খুল্লনা করে মঙ্গল আরতি ॥
বধূকে লইল তাঁরা করিয়া বরণ।
ধূপ দীপ পুষ্পে করে চণ্ডীর পূজন ॥
একথা শুনিয়া রাজা বিক্রম-কেশরী।
মনুষ্য পাঠায়ে দিল অতি শীঘ্র করি ॥
রাজকন্যা আছে তাঁরো অপূর্ব্ব সুন্দরী।
শ্রীমন্তকে বিয়া দিল আপন কুমারী ॥
বাড়িল সম্পদ তাঁর পূরিল কামনা।
মঙ্গল চণ্ডীর জয় জগতে ঘোষণা ॥

অপুত্রের পুত্র হয় নির্ধনের ধন ।
অন্ধ জনে চক্ষু লাভ বন্ধন মোচন ॥
বিবাহ কামনা করি পুত্র-কন্যাবতী ।
মনোমত কন্যা-বর লভে শীঘ্রগতি ॥
যে গৃহেতে পূজা পান চণ্ডী ভগবতী ।
চোর অগ্নি ভয় নাই নাহিক দুর্গতি ॥
প্রণাম করিয়া দ্বিজ জনার্দ্দন পায় ।
পাঁচালী উদ্ধার-ব্রতী পরমেশ রায় ॥
যে অক্ষর পরিভ্রষ্ট মাত্রাহীন যাহা ।
জনার্দ্দন প্রসাদাৎ পূর্ণ হোক তাহা ॥

প্রণাম । সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ সাধিকে ।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥
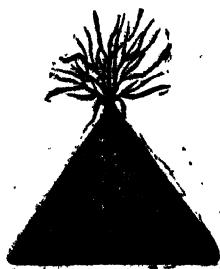
(মঙ্গলচণ্ডীর "শেখর" বা অর্ঘ্য ।)

সঙ্কট মঙ্গলচণ্ডী ব্রত।

এই ব্রত অগ্রহায়ণ মাসে যে কোন মঙ্গলবারে একবার কর্ত্তব্য। অগ্রহায়ণে নানাবিধ বার-ব্রত। এজন্য অগ্রহায়ণে করিতে না পারিলে মাঘ মাসেও করা যাইতে পারে। ইহা কেবল সধবাদেরই কর্ত্তব্য।

"শেখর" বা অর্ঘ্য নির্ম্মাণের বিশেষত্ব পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। কলা-পাতার পরিবর্ত্তে ক্ষুদ্র রেশম বস্ত্র খণ্ড দ্বারা আতপ তণ্ডুল ও দূর্ব্বা বাঁধিতে হয়। এই ব্রত একজন; দুইজন অথবা চারি জন সধবা রমণী একত্র করিতে পারেন। তিনজনে করিবে না।

পূজান্তে ব্রত-চারিণী স্বয়ং রন্ধন করিয়া আহার করিবেন। রন্ধন সময়ে উপবেশন প্রণালী একটু কষ্টকর। দক্ষিণ জানুর নিম্নে দক্ষিণ হস্ত বাড়াইয়া সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিতে হয়। ইহার নাম সঙ্কটাবস্থা। যতজন ব্রত করিবেন ততবার স্বতন্ত্রভাবে অন্ন পাক করিতে হইবে। ব্যঞ্জনাদি একত্র হইলে দোষ নাই। এক জনেই সকলের রান্না করিতে পারেন, অপর ব্রতচারিণীগণ সঙ্কটাবস্থায় উপবিষ্ট হইয়া বাটনা বাটা কুটনো কাটা প্রভৃতি রন্ধনের সহায়তা করিবেন। এই প্রকারে রন্ধন, ভোজন, আচমন ও তাম্বুল সেবনের পর একজন অপরকে বলিবেন, "সঙ্কটে পার হই?" তিনি উত্তর দিবেন, "হও"। এইরূপে তিনবার অনুমতি প্রার্থনাসূচক প্রশ্ন ও অনুকুল উত্তর হইলে সঙ্কটাবস্থা পরিত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করিবেন। এই প্রকারে একে একে সকলেই সঙ্কট-মুক্ত হইবেন। ব্রতের কথা রন্ধনের

সময় সঙ্কটাবস্থায় উপবিষ্ট হইয়া শুনিতে হয়। রন্ধনে "সঙ্কট"-সঙ্গিনী পাইলে সুবিধা এই যে কথা শ্রবণ ও গল্প গুজবে উপবেশন ক্লেশের কিঞ্চিৎ লাঘব হয়।

("সঙ্কট" ব্রত-চারিণীর রন্ধন।)

সঙ্কট-মঙ্গলচণ্ডী ব্রত কথা।

এক ছিল রাজা; তাঁর ছিল সাত রাণী। রাজার ছেলে পুলে কিছুই হয় নাই; এজন্য তিনি বড় দুঃখিত থাকিতেন। একদিন রাজা সকালে উঠে দেখেন, উঠনে ঝাঁট দেওয়া হয় নাই। তিনি মহা রাগান্বিত হ'য়ে হুকুম দিলেন, ঝাড়ুদার মেতরকে ধ'রে নিয়ে এস; আমি এখুনি জল্লাদ দিয়ে তার গর্দানা নেবো। হুকুম পেয়ে কোটাল মেতরবাড়ী ছুটে গেল। গিয়ে দেখলে, মেতর খেতে বসেছে। কোটাল বল্লে, হাঁরে তোর আক্কেলটা কি, রাজবাড়ীর কাজ ফেলে তুই কিনা এর

সকালে খেতে বসেছিলুম্। ঝাড়ুদার উত্তর কল্লে, গোলামের বেয়াদবি মাফ করেন তো বলি। আমায় অনেক কাচ্চা বাচ্চা নিয়ে ঘর কত্তে হয়, সকালে ওই আঁটকুড়ে অনামুখো রাজার মুখ দেখে আমাদের একদিনও খাওয়াটা ভাল হয় না। তাই আজ মনে করলুম, আগে খেয়ে তার পর রাজবাড়ী যাব। মেতরের মুখে এই কথা শুনে কোটাল অবাক্ হয়ে গেল। ফিরে এসে রাজাকে বল্লে, মহারাজ ভয়ে বলবো, কি নির্ভয়ে বলবো? রাজা বল্লেন, ভয় আবার কেন, নির্ভয়ে বল। কোটাল মেতরের আস্পর্দ্ধার কথা রাজাকে সব জানালে। শুনে, রাজার মুখ এতটুকু হয়ে গেল। তিনি মনের দুঃখে ভাবলেন, যা, আর এ এ মুখ কা'কেও দেখাব না। সামান্য মেতরও আমায় ঘেন্না করে! রাজা কা'কেও কিছু না ব'লে, একেবারে অন্দরে গিয়ে দরজা বন্ধ ক'রে লেপমুড়ি দিয়ে শুয়ে রইলেন। এমন সময়ে রাজ সভায় এক সন্ন্যাসী ঠাকুর উপস্থিত। সন্ন্যাসী উজীর নাজীরকে বল্লেন, এখনি রাজাকে আমার আগমন সংবাদ দাও। তারা সকলে ভাবলে, এখন উপায়! সাধু সন্ন্যাসীর কথা অবহেলা করা অকল্যাণ, অথচ রাজাকে খবর দেওয়া কারু সাধ্যি নয়। অবশেষে সন্ন্যাসী এসেছেন শুনে রাণীরা অনেক সাধ্যি-সাধনা ক'রে রাজাকে বাইরে পাঠিয়ে দিলেন। সন্ন্যাসী বল্লেন, ওহে রাজা, আমি সব জান্তে পেরেছি, তোমার আর চিন্তা নেই। তুমি এক কাজ কর। এই শিকড়টী তোমায় দিলুম, মধু আর পানের রস দিয়ে রাণীদের খাইয়ে দাও; তবেই তাঁদের ছেলে হবে। কিন্তু তুমি এই সত্য কর, আমার পছন্দ মত একটী ছেলে আমাকে দান কর্ব্বে। রাজা স্বীকৃত হ'লেন। অলৌ-

ভাবলেন, সাতটী হ'লে একটী দেবো তা আর এমন বেশী কি।

সন্ন্যাসী বিদায় হইলেন। রাজা শিকড় নিয়ে রাণীদেরে দিলেন। ছোট রাণীর উপরই রাজার প্রাণের টান একটু বেশী; এজন্যে আর ছ'রাণী তাকে না দিয়ে নিজেরাই সব শিকড়ের অসুদ খেয়ে ফেল্লে। তার পর যখন ছোট রাণী এসে অসুদ চাইলে, তখন তারা বল্লে, সে কি বোন্, তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে? তোমাকে না খুঁজেছি এমন জায়গা নেই। যাও, ঐ শিলনোড়া ধুয়ে খাওগে; এখনো ওতে একটু লেগে অবিশ্যি রয়েচে। ছোট রাণী অতি ভাল মানুষ, তিনি তাই কল্লেন।

তার পর দু'মাস, তিন মাস, চার মাস গুণতে গুণতে নয় মাস চলে গেল। দশম মাসে ছ'রাণীর ছ'টী ছেলে হলো। কিন্তু কোনটীই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নয়। কা'রও কাণা, কা'রও খোঁড়া, কা'রও বা কুঁজো এইরূপ ছ'রাণীর ছ'ছেলে হলো। আর ছোট রাণীর? তিনি একটী শঙ্খ প্রসব কল্লেন! রাজা বল্লেন, এদের বা হোক মানুষের চেহারা হয়েচে; ছোট রাণীর এটা কি হলো। রাজা আর ছোট রাণীর কাছে ঘেঁসলেন না। ছোট রাণী মনের দুঃখে, সতীনদের বাক্যিযন্ত্রণা এড়াবার জন্যে রাজবাড়ী ত্যাগ ক'রে তাঁর কোলের শাঁকটী নিয়ে কাছেই এক কুঁড়ে ঘরে বাস কত্তে লাগলেন।

এইরূপে কিছু দিন গেল। ছোট রাণীর শাঁক ক্রমেই বাড়তে লাগলো। রাত্তিরে ঘুমের ঘোরে তিনি টের পেতেন কোন শিশু যেন তাঁর বুকের দুধ চুষে খাচ্চে। ঘুম ভাঙ্গলে কিছুই দেখতে পেতেন না। আর তাঁর বিছানা শিশুসন্তানের

নাই-প্রস্রাবে নোংরা হইত। একদিন রেতে তিনি ঘুমের ভাণ করে শুয়ে আছেন, হঠাৎ দেখতে পেলেন শাঁকের ভেতর থেকে এক পরম সুন্দর বালক বের হয়ে খেলা কচ্চে। যেই দেখা আর অমনি তিনি তার হাত ধরে ফেলে বল্লেন, সোণারচাঁদ ছেলে আমার! তোমার মতন ছেলে যার, তার এই দুর্দশা! আর তোমায় আমি ছাড়বো না। এই ব'লে তিনি, বালক শাঁকের ভেতর আর না লুকোয় এইজন্যে, শাঁকটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। ছেলে বল্লে, মা! তুমি কি করলে, আজই সেই সন্নেসীর মাথায় টনক্ পড়বে, আমাকে এসে নে যাবে। অমন সুন্দর ছেলের মুখে মধুর 'মা' ডাক শুনে ছোট রাণী আনন্দে আত্মহারা হলেন। তিনি ভাবলেন, আগেতো রাজাকে তাঁর ছেলে দেখাইগে, তার পরে অদেষ্টে যা থাকে হবে। মা মঙ্গলচণ্ডীর নাম স্মরণ ক'রে খুব ভোরে উঠে, ছোট রাণী ছেলে নিয়ে রাজার কোলে দিলেন। রাজা দেখলেন, ছেলেতো নয়, যেন কার্ত্তিক। তিনি আনন্দে অধীর হ'য়ে বল্লেন, এই ছেলেই রাজপুত্র হ'বার যুগ্যি। এমনি সময়ে দো'রে সেই সন্ন্যাসী ঠাকুর উপস্থিত। সন্ন্যাসীকে দেখে রাজার প্রাণ যেন উড়ে গেল। তাঁর মনে যেন অন্ধকমুনির শাপ জেগে উঠলো। তিনি ছোট রাণীর ছেলেকে একটুখানি আড়ালে রেখে আর ছ'ছেলেকে সম্মুখে দাঁড় করালেন। সন্ন্যাসী সামনে যাকে দেখলেন সেই ছেলেকে নিয়ে তখনি বিদায় হলেন। কিছুদূর গিয়ে সন্ন্যাসী ছেলেকে জিজ্ঞাসা কল্লেন, তুমি সোজা পথে যাবে, কি বাঁকা পথে যাবে? বাঁকা পথে জঙ্গল ও বাঘ ভালুকের ভয়। ছেলেটা বল্লে, আমি রাজার বেটা রাজা, আমি কেন মিছিমিছি বাঘ

ভালুকের মুখে মারা যাব ? সেই পথে চল যে পথে কোন ভয় নেই। উত্তর শুনে সন্ন্যাসী রাজার কাছে ফিরে এসে বল্লেন, এ ছেলেতে আমার কাজ নাই, আমারটী আমাকে দাও। এই ব'লে, তাঁহার হাতে শাঁক ছিল, তা'তে ফু দিয়ে 'শঙ্খনাথ বুটেশ্বর' ব'লে ডাকৃতেই ছোট রাণীর ছেলে খেলা ফেলে ছুটে এলো। সন্ন্যাসী তাকে নিয়ে চ'লে গেলেন। রাজা ও ছোট রাণীর মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়লো। রাজা কাঁদতে লাগলেন। ছোট রাণী দুর্গা নাম জপ কত্তে কত্তে গলায় আঁচল দিয়ে বল্‌তে লাগলেন, মা মঙ্গলচণ্ডি! এ সঙ্কট হ'তে উদ্ধার কর। পাড়ার পাঁচ মেয়ে এসে ছোট রাণীকে বল্লে, তুমি সঙ্কট মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত কর; তবেই ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসবে।

এদিকে, কিছুদূর গিয়ে সন্ন্যাসী শঙ্খনাথ বুটেশ্বরকে জিজ্ঞেস কল্লেন, তুমি সোজা পথে যাবে, কি বাঁকা পথে যাবে ? বাঁকা পথে জঙ্গল ও বাঘ ভালুকের ভয়। শঙ্খনাথ বল্লে, আমি রাজ-পুত্র, কা'কেও ভয় করি না; আর শিকার করাই রাজধর্ম্ম। তুমি বাঘ ভালুকের রাস্তায় আমাকে নিয়ে চল। সন্ন্যাসী তুষ্ট হ'লেন। আবার অনেক দূর গিয়ে জিজ্ঞেস কল্লেন, এ পথে চোরের ভয়, ও পথে ডাকা'ত; কোন্ পথে যাবে ? শঙ্খনাথ বল্লে, আমি আগে ডাকা'ত শাসন করবো, ডাকা'তের পথে চল। সন্ন্যাসী তুষ্ট হ'লেন; মনে ভাবলেন, ছেলেটী মা'য়ের পুজোর যুগ্যি বটে।

এইরূপে চলিতে চলিতে, তিন চার রাজার রাজ্য পার হ'য়ে তাঁরা এক ভীষণ অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। সেখানে এক মন্দি-রের ভিতর কালীমূর্ত্তি, আর সন্ন্যাসীর থাকিবার এক খানি ঘর।

উভয়ে স্নান করিলেন। স্নানের পর সন্ন্যাসী রাজপুত্রকে বল্লেন, তুমি আমার ঘরের ভিতর খানিক বিশ্রাম কর। ঘরের ভিতর সব দিকে দেখতে পার, কিন্তু সাবধান, উত্তর দিকটা দেখিও না। এই বলিয়া তিনি মন্দিরে পূজার আয়োজনে বসিয়া গেলেন। শঙ্খনাথের মনে কেমন একটা সন্দেহ জন্মালো। সব দিক দেখতে পারবো, তাতে কিছু দোষ নেই, যত মানা হ'লো কি-না ওই উত্তর দিকটায়! এই ভাবিয়া তিনি প্রথমেই উত্তর দিকের দরজা খুলিলেন। খুলিয়া দেখেন একটা রক্তের পুকুরে অসংখ্য কাটামুণ্ড পদ্মের মত ভাসচে। রাজপুত্রকে দেখে তারা খিল্‌খিল্ ক'রে হাঁসতে লাগলো। শঙ্খনাথ আশ্চর্য্য হ'য়ে বল্লেন, তোমরা কে? আর আমাকে দেখে হাঁসচো কেন? কাটা মুণ্ডগুলি বল্লে, আজই আমাদের দলে আর একটী লোক পাব এই ভেবে আমাদের হাসি এলো। সন্ন্যাসী আমাদের দেবীর কাছে বলি দিয়েছে, তোমারও এই দশা করবে। রাজপুত্র বল্লেন, এখন তবে উপায়? তারা পরামর্শ দিলে, সন্ন্যাসী পূজা শেষ ক'রে তোমায় দেবীর কাছে মাথা হেঁট করে প্রণাম কত্তে বলবে; তুমি কখনও প্রণাম করো না। সাবধান! প্রণাম করেছ, কি মারা গিয়েছ। শঙ্খনাথ মঙ্গলচণ্ডীর নাম স্মরণ কত্তে লাগলেন।

এদিকে সন্ন্যাসীর আহ্লাদের আর সীমা নাই; ১০৭ টা বলি শেষ হইয়া গেছে, এইটা হ'লেই তাঁর মানসিক পূর্ণ হয়। তাড়াতাড়ি কোন রকমে পূজো শেষ করে ফেল্লেন; সমস্ত পূজাও হ'য়ে উঠলো না। মা কাত্যায়নী বিরূপ হ'লেন; সেবার তাঁর পূজা আর গ্রহণ কল্লেন না। যাই হোক, সন্ন্যাসী তো রাজপুত্রকে মন্দিরে নিয়ে এলেন। তিনি বল্লেন, শঙ্খনাথ!

দেবীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম কর। শঙ্খনাথ মা কাত্যায়নীকে মনে মনে প্রণাম ক'রে মুখে বল্লেন, আমি রাজপুত্র, প্রণাম পেয়েছি ছাড়া প্রণাম কেমন করিয়া করিতে হয় তাহা জানি না। তুমি আগে প্রণাম ক'রে দেখিয়ে দাও। আমি তাই দেখে শেখে প্রণাম করবো। সন্ন্যাসী হাতের খাঁড়া মাটীতে রেখে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। আর অমনি দেবীর ইঙ্গিতে, রাজপুত্র খাঁড়া হাতে ক'রে সন্ন্যাসীকে এক কোপে কেটে ফেল্লেন। সন্ন্যাসীর রক্ত হ'তে আবার নূতন সন্ন্যাসী জন্মাতে লাগলো। একজন কাটেন তো দশজন হয়। কিছুতেই সন্ন্যাসীর ক্ষয় হয় না। তখন দেবীর আদেশ হইল, "ডাইনে কেটে বাঁয়ে (খাঁড়া) মোছ, বাঁয়ে কেটে ডাইনে মোছ।" শঙ্খনাথ তাই কল্লেন। তখন সব রক্তবীজ সন্ন্যাসী নিপাত হলো। শঙ্খনাথ পূজার ফুলজল রক্ত পুকুরে কাটা মুণ্ডের উপর ছড়িয়ে দিলেন; তখন তারা সকলে বেঁচে উঠলো, আর রাজপুত্রকে ধন্য ধন্য কত্তে লাগলো। তিনি মা চণ্ডীকে প্রণাম ক'রে স্বদেশ যাত্রা কল্লেন। শঙ্খনাথের নাম দেশময় ছড়িয়ে গেল। পথে এক রাজা তাঁর কন্যার সঙ্গে শঙ্খনাথের বিয়ে দিয়ে অর্দ্ধেক রাজত্ব দান কল্লেন।

রাজপুত্তুর বৌ নিয়ে বাজি বাজনা ক'রে বাড়ী চল্লেন। সে দিন অগ্রাণ মাস মঙ্গলবার, ছোট রাণী সঙ্কট মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত ক'রছিলেন। পাড়ার পাঁচ মেয়ে ছুটে এসে বল্লে, ওঠ মা, তোর ছেলে রাজকন্তে বিয়ে ক'রে বাড়ী আসচে। ছোট রাণী বল্লেন, ছেলেকে বাইরে খানিক অপেক্ষা কত্তে বল। আমি এখন উঠতে পারবো না। তার পর, ব্রত সমাপন করিয়া 'সঙ্কট' [২৩ পৃষ্ঠায় উপবেশন প্রণালী দেখ] হ'তে উঠে, তবে ছেলে

বউকে বরণ ক'রে ঘরে আন্‌লেন। রাজা ও ছোট রাণী ছেলে ও বউ পেয়ে মহাসুখী হলেন। তাঁরা সুখে স্বচ্ছন্দে রাজত্ব করতে লাগলেন।

এই ব্রত কল্লে অপুত্রের পুত্র হয়, নির্ধনের ধন হয়, আপদ বালাই দূর হয়। চিরকাল সুখে যায়।

অরণ্যষষ্ঠী ব্রত।

জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লষষ্ঠীতে অরণ্যষষ্ঠী, ব্রত করিতে হয়। এই মাসে ফল-শ্রেষ্ঠ পক্ক আঁম্রের আধিক্য বশতঃ আম্রফল নৈবেদ্যের প্রধান উপকরণ। এজন্য চলিত কথায় ইহার অপর নাম আম-ষষ্ঠী ব্রত। বলা বাহুল্য এ দিবস জামাই বাবুদের স্মরণীয় দিন।

স্ত্রীলোকেরা তালবৃন্ত ও পূজার দ্রব্যাদি লইয়া বনে গমন পূর্ব্বক অরণ্যষষ্ঠী দেবীকে পূজা করিবেন, এইরূপ শাস্ত্রের বিধান। অরণ্যে পূজার ব্যবস্থা বটে, কিন্তু অরণ্য বঙ্গীয় পুরুষদের পক্ষেও সুগম নহে। এজন্য গৃহিণীগণ গৃহ মধ্যেই (প্রাঙ্গনেও নহে) অরণ্য কল্পনা করিয়া ষষ্ঠীদেবীর পূজা করিয়া থাকেন। পাহাড় জঙ্গল সুলভ শিলাখণ্ডে ষষ্ঠীদেবীর অধিষ্ঠান কল্পিত হয়। অন্য প্রস্তর খণ্ডের অভাবে মশলা পেশণী "নোড়া" দ্বারাই কার্য্য নিষ্পন্ন হয়। কুলবতীগণ সিন্দূর-লিপ্ত একটী ভগ্নাবশেষ নোড়া এই বার্ষিক ব্রতের জন্য সযত্নে গৃহে তুলিয়া রাখেন।

গৃহের ভিতর অরণ্য কল্পনা মন্দ নয়। অনেক নিরীহ ব্যক্তি

অপ্রিয়বাদিনী ভার্য্যার সঙ্গে কলহ করিয়া শাস্ত্রীয় ব্যবস্থার মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্ত অরণ্যগমনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। অতঃপর বোধ হয় তাঁহাদের গৃহে রহিয়া গেলেই চলিবে। যথা গৃহং তথা অরণ্যং!

পুরোহিত যথা-বিধি পূজা করিবেন। ধ্যান যথা;

দ্বিভুজাং হেম গৌরাঙ্গীং রত্নালঙ্কার ভূষিতাং।
বরদাভয়হস্তাঞ্চ শরচ্চন্দ্র নিভাননাং॥
পট্টবস্ত্র পরিধানাং পীনোন্নত পয়োধরাং।
অঙ্কার্পিত সুতাং ষষ্ঠীমার্জ্জারস্থাং বিচিন্তয়েৎ॥

পূজান্তে ব্রত কথা শ্রবণ ও ব্রত নির্দ্দিষ্ট কার্য্যাদি করিয়া সে দিবস ফলমূলাদি আহার করিতে হয়। ব্রতের ফল, সন্তান লাভ ও পুত্র কন্যার দীর্ঘ জীবন।

ব্রতের সংকল্প বাড়ীর মেয়েদের নামে হয়। যতজন ব্রত করিবেন ততটী (১) বীজন বা পাখা, (২) পক্ব আম্র ও (৩) দূর্ব্বাগুচ্ছ আবশ্যক। এই দূর্ব্বাগুচ্ছ পূর্ব্বদিন অপরাহ্ণে বাড়ীর কন্যাগণ দূর্ব্বাক্ষেত্র হইতে সযত্নে সংগ্রহ করেন। "ছয় কুড়ি ছয় গাছি" * দীর্ঘবৃন্ত দূর্ব্বা এবং ছয়টী নূতন বাঁশপাতার অগ্রভাগ একত্র করিয়া কলাগাছের ছোবড়া বা আঁশ দ্বারা বাঁধিতে হয়। এতেই একটী দূর্ব্বাগুচ্ছ বা এক আটি দূর্ব্বা হইল।

পূজা স্থলে পিটুলীর বিচিত্র আলিপনা দিবে। প্রত্যেক ব্রতচারিণীর নির্দ্দিষ্ট পাখার উপর একটী পাকা আম ও পূর্ব্বোক্ত এক আটি দূর্ব্বা স্থাপন করিয়া পূজাস্থলে রাখিবে। পাখার

* সর্ব্ববিধ ষষ্ঠীব্রতে "ছয়" সংখ্যাটির বড় সমাদর।

সিন্দুরের ফোঁটা দেওয়া বিধি। একটী কলা, একটী সুপারি ও একটী পান একত্র করিলে এক ভাগ হইল। এইরূপ প্রতি ব্রতচারিণীর নিমিত্ত ছয় ভাগ দিয়া কুচো নৈবেদ্যের ন্যায় এক খানি বা ততোধিক বড় ডালা সাজাইয়া দিবে। তাম্বুলপত্র দোভাঁজ করিয়া খড়কে দ্বারা আবদ্ধ করিয়া দিতে হয়। অন্য নৈবেদ্যাদিও দিবে।

পূজার পূর্ব্বে (ষষ্ঠীতিথি কাল সংকীর্ণ হইলে পূজার পরে হইলেও চলে) ব্রতচারিণী তাঁহার নির্দ্দিষ্ট পাখা, আম ও দূর্ব্বার আঁটি লইয়া স্নান করিবেন। কেহ গায়ে তৈল মাখিবেন না। এস্থলে বলা আবশ্যক ষষ্ঠীব্রতের দিন তৈল ও আমিষ নিষিদ্ধ। বুকজলে দাঁড়াইয়া পাখা ও আম বাঁ হাতে রাখিয়া দূর্ব্বার আঁটি দ্বারা "ছয় কুড়ি ছয় বার" চোখে জলের ছিটা দিবেন। পরে ঐ তিন দ্রব্য ডান হাতে লইয়া বুকে ছয় বার জল দিতে হয়। স্নানান্তে ঐগুলি পূজাস্থলে রাখিয়া দিবেন। পূজা শেষে ফুল হাতে করিয়া ব্রতকথা শুনিতে হয়। কতগুলি অতিরিক্ত দূর্ব্বা (আঁটি বাঁধা নয়) পূর্ব্বেই সংগৃহীত থাকে। ইহাকে "ষাট বাছা" দূর্ব্বা বলে। কথা শ্রবণের পর এক এক গাছি দূর্ব্বা লইয়া পূর্ব্বোক্ত নোড়ার উপর দিবে এবং এইরূপ বলিবে, যথা;

অগ্রহায়ণে * মূলো ষষ্ঠী, ষাট ষাট ষাট (দূর্ব্বাদান)

---

* অগ্রহায়ণ মাসের নাম সর্ব্ব প্রথমে উল্লেখ করিতে হয়। এই মাসে বঙ্গদেশে শস্য প্রাচুর্য্য হেতু সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত হয়। এজন্য বৎসরের অপর গুলি অপেক্ষা ইহাকে শ্রেষ্ঠ (অগ্র) মাস কহে। মেয়েলি বারব্রত অগ্রহায়ণ মাসে যত; আর কোন মাসে তত নয়।

পৌষে লোটন ষষ্ঠী, (ঐ)। মাঘে শীতলা ষষ্ঠী, (ঐ)।
ফাল্গুনে গুণো ষষ্ঠী (ঐ)। চৈত্রে অশোক ষষ্ঠী, (ঐ)।
বৈশাখে দই ষষ্ঠী, (ঐ)। জ্যৈষ্ঠে অরণ্য ষষ্ঠী,
অরণ্যে গেলেও ঝি পুত ফিরে আসে (দুর্ব্বাদান)।
আষাঢ়ে চাপড় ষষ্ঠী, (ঐ)। শ্রাবণে লুণ্ঠন ষষ্ঠী, (ঐ)।
ভাদ্রে অক্ষয়া ষষ্ঠী, (ঐ)। আশ্বিনে বোধন ষষ্ঠী, (ঐ)।
কার্ত্তিকে শ্মশান ষষ্ঠী, শ্মশানে গেলেও ঝি পুত
ফিরে আসে। ষাট ষাট ষাট (দুর্ব্বাদান)।

অতঃপর,

কালী, দুর্গা ও গৃহদেবতার নাম উল্লেখ করিয়া ... ষাট,
ষাট, ষাট (দুর্ব্বাদান)।

তার পর,

ছেলে, মেয়ে, বউদের নাম করিয়া · (পূর্ব্ববৎ দুর্ব্বাদান করিবে।)

তৎপর ডালার আম কলা পান সুপারি এক এক ভাগ তুলিয়া এক জন অপরের হাতে দিবেন। ইহাকে বায়না বদল করে। ননদ ও ভাই-বৌতে, জা'য়ে জা'য়ে এইরূপ বদল চলে। কিন্তু শাশুড়ী-বৌ'তে হয় না।

অনন্তর লোড়ার উপর আলো চাউল ছিটাইয়া বলিতে হয়, যথা ;

নিজ পেটে নাই এলো-মেলো (খুরপাক) ষাট ষাট ষাট (চা'ল নিক্ষেপ)।

বৌর পেটে নাই (ঐ)। চা'ল নিক্ষেপ। ঝির পেটে নাই (ঐরূপ)।

অবশেষে একে একে ছেলে মেয়ে ও বাড়ী শুদ্ধ সকলের গা'য়ে পূর্ব্বোক্ত দূর্ব্বার আটি দ্বারা জল ছিটাইয়া ও পাখার বাতাস দিয়া বলিবে ;

"জ্যৈষ্ঠ মাসের ষষ্ঠীপূজা, ষাট ষাট ষাট !"

অরণ্যষষ্ঠী ব্রত কথা ।

এক ছিলেন ব্রাহ্মণ । তাঁর ব্রাহ্মণীর সন্তান হ'য়ে বাঁচে না । সন্তান হ'লেই মা ষষ্ঠীর বাহন কালো বেড়াল মুখে ক'রে নিয়ে ষষ্ঠীঠাকুরুণের কাছে ছেলে দিয়ে আস্‌তো । ব্রাহ্মণের এজন্য দুঃখের সীমা নাই । তিনি ভাবলেন আমার না ব্রাহ্মণীর যে কি অপরাধ হ'য়েছে তা' কিছুই ঠাওরাতে পাচ্ছেন না । রবি

ছেলেই না বাঁচলো তবে আর সংসারে থেকে সুখ কি। শুনেছি ষষ্ঠীঠাকুরুণ পাহাড় জঙ্গলে থাকেন। তাঁকে খুঁজে বের ক'রে কষ্টের কথা জানাব। আর যদি তাঁর দেখা না পাই তাহ'লে আর ঘরে ফিরবো না। মনের কষ্টে তিনি একদিন ব্রাহ্মণীকে ঘরে রেখে ষষ্ঠীদেবীর উদ্দেশে যাত্রা করলেন।

পথে এক গাইগোরুর সঙ্গে দেখা। গোরু বল্লে, ঠাকুর গো! প্রণাম হই; কোথায় যাচ্ছ? ব্রাহ্মণ বল্লেন, আমার দুঃখের কথা বলতে ষষ্ঠীঠাকুরুণের কাছে যাচ্ছি। তাই শুনে গাই বল্লে, ঠাকুর! আমারও দুঃখের কথা আছে। দেখ আমার এত দুধ হয়েছে, তা' মানুষেও নেয় না, বাছুরেও খায়না। বাঁটের বেদনায় আমি দিন রাত অস্থির আছি। তোমার পায়ে পড়ি, ষষ্ঠীঠাকুরুণের কাছে আমার কথাটা ব'লো। ব্রাহ্মণ স্বীকার কল্লেন।

জ্যৈষ্ঠ মাস, দারুণ রোদ; ব্রাহ্মণ পথে যেতে যেতে এক আম গাছের তলায় বিশ্রাম করতে গেলেন। তখন আম গাছ বল্লে, ঠাকুর! কোথায় যাচ্ছ? "ষষ্ঠীঠাকুরুণের কাছে যাচ্ছি।" কেন? "আমার দুঃখের কথা বলতে।" তাই শুনে আম গাছ বল্লে, ঠাকুর গো, আমার গতি কি হবে! আমার দেখ কত ফল হয়েছে, তা' মানুষেও নেয় না, ঝড়েও পড়ে না, কাকেও খায় না। বোঁটার ব্যথায় আমি অস্থির হয়েছি। তোমার পায়ে পড়ি, ষষ্ঠীঠাকুরুণের কাছে আমার কথাটা মনে ক'রে ব'লো। ব্রাহ্মণ সম্মত হ'লেন।

তারপর এক কাঠকুড়ুনী মেয়ের সঙ্গে দেখা। তার মাথায় এক বোঝা খড় ও কাঠ। সে বল্লে, দাদা ঠাকুর! আমার

দুঃখের কথাটা ষষ্ঠীঠাকৃরুণের কাছে অবশ্য ক'রে বলো। আমার খড় ও কাঠ কেউ কিনে নেয় না, আর মাথা থেকেও বোঝা নামে না।

পথে আবার এক গরীবের মেয়ের সঙ্গে দেখা। তার মাথায় এক মালশা চুণ। সেও বল্লে, আমার এই চুণ কেউ কিনে নেয় না, আর মাথা থেকেও মালশা নামে না। ঠাকুর, আমার কথাটাও যেন মনে থাকে।

তার পর পথে যেতে যেতে আরও একজন দুঃখী মেয়েমানুষের সঙ্গে দেখা। তার কোলে এক ছেলে, ঢেঁকির উপর এক পা। সেও বল্লে, ঠাকুর আমার দুর্দ্দশা দেখ; ঢেঁকি থেকে পা কিছুতেই নামাতে পারি না; ছেলেও কোল থেকে নামাতে পারি না। ঠাকুর গো! আমার উপায় কি হবে? তোমায় গড় করি, আমার কথাটা ভুলো না।

ব্রাহ্মণ অনেক কষ্টে খোঁজ খবর ক'রে এক মহা অরণ্যে ষষ্ঠীদেবীর সাক্ষাৎ পেলেন। তিনি দেখলেন, অপরূপ! ষষ্ঠীঠাকৃরুণের চাঁদপানা মুখ, সোণার অঙ্গে হীরে মাণিক, সিঁতেয় সিন্দূর, মুখে পাণ, কোলে এক টুকটুকে ছেলে, "সোণার খাটে গা, রূপোর খাটে পা, চা'দ্দিকে বইচে শ্বেত চামরের বা।"

ব্রাহ্মণ প্রণাম ক'রে করযোড়ে দাঁড়ালেন। ষষ্ঠীঠাকৃরুণ বল্লেন, তুমি কেন এসেছ তা জানি। তোমার ব্রাহ্মণী ছেলেপুলের আদর যত্ন কিছুই জানে না। আমার-দেওয়া সন্তানকে তুচ্ছ করে। এজন্য তার ছেলে বাঁচে না। তুমি আমার কাছে এই প্রতিজ্ঞা ক'রে যাও, এবার ছেলে হ'লে তোমরা তার গায় হাত তুলবে না, কেবল 'ষাট সোণা' ব'লে আদর করবে, আব্দার

সয়ে থাকবে। তা যদি কত্তে পার তবেই আমি তোমাদের কাছে ছেলে রাখবো, নইলে আমার ছেলে আবার আমার কাছে ফিরে আসবে। ব্রাহ্মণ স্বীকার কল্লেন।

তারপর তিনি সেই গাইগোরু, আম গাছ, আর মেয়ে তিনটীর কথা একে একে নিবেদন কল্লেন। ষষ্ঠীঠাকরুণ বল্লেন, এক বামুন দেব-সেবার জন্যে দুধ চেয়েছিল। যখন দুধ দোয় তখন গাইটা দুধ চুরী করেছিল। এজন্যে তার ঐ দুর্দ্দশা। একজন বামুনকে অকাতরে দুধ ছেড়ে দি'ক, তবেই তার ভাল হ'য়ে যাবে এখন।

আম গাছের কথা শুনে ষষ্ঠী বল্লেন, এক বামুন দেব-সেবার জন্যে একটী পাকা আম নিতে এসেছিল। গাছটী ফলের বোঁটা শক্ত ক'রে টেনে রেখেছিল, এজন্যে তার ঐ দশা হয়েছে। একজন বামুনকে সমস্ত ফল দি'ক, তবেই তার ভাল হবে।

কাঠকুড়ুনী মেয়ের কথা। সে একজনের মাথায় খড়ের কুটা দেখেও কিছু বলে নি, এজন্যে তার ঐ দশা। একজন বামুনকে সব খড় কাঠ দি'ক, তবেই তার ভাল হবে।

চুণ ওয়ালীর কথায় ষষ্ঠী বল্লেন, সে একজনের মুখে চুণের দাগ দেখেও কিছু বলেনি, এজন্যে তার ঐ দশা। একজন বামুনকে চুণের মালশা দি'ক, তবেই তার ভাল হবে।

আর ঢেঁকি থেকে যার পা নামে না। ঐ আবাগী এক বামুনের বাড়ীতে দাসীপনা করতো; তখন সে কাজ ফাঁকি দিত। এই জন্যে তার ঐ দুর্দ্দশা। এখন এক বামুনের বাড়ীতে কাজ করুক গে, তবেই তার ভাল হবে।

ব্রাহ্মণ ষষ্ঠী ঠাকুরুণের নিকট হইতে বিদায় হ'লেন। ফিরি-

বার পথে প্রথমে ঐ দাসীর সঙ্গে দেখা। সে বল্লে, ঠাকুর গো! প্রণাম হই। আমি তোমার জন্যে পথের পানে চেয়ে আছি। ব্রাহ্মণ বল্লেন, হাঁ বাছা, তোমার কথা বলেছি। তুমি আগে এক বামুনের বাড়ীতে দাসী ছিলে; কেমন? "হাঁ, ঠাকুর ঠিক বলেছ।" ষষ্ঠী ঠাকরুণ বল্লেন, তখন তুমি কাজে গাফিলি কোরতে। এই জন্যেই তোমার এই দশা। ষষ্ঠী বল্লেন, তুমি এক বামুনের বাড়ীতে কাজ কর গে, তবেই তোমার ভাল হবে। তাই শুনে সে বল্লে, ঠাকুর বাঁচলুম; তুমিই তো বামুন, তোমার বাড়ীতেই আমি কাজে লেগে যাই। ব্রাহ্মণ বলিলেন, আচ্ছা চল।

তারপর চূণওয়ালী, কাঠকুড়ুণী, আমগাছ ও অবশেষে গাইয়ের সঙ্গে দেখা হলো। তারা সব কথা শুনে, তিনিই তো ব্রাহ্মণ এজন্য তাঁকেই চূণ খড়কাঠ, আম ও দুধ দিতে চাইলে। ব্রাহ্মণ অগত্যা স্বীকার কল্লেন। তারা মুক্ত হলো।

ব্রাহ্মণ বাড়ীতে এলেন। কিছুকাল পরে মা ষষ্ঠীর বরে তাঁর এক পরম সুন্দর ছেলে হলো। মা বাপের মুখে সদাই কেবল "ষাট, বাছা, সাত রাজার ধন মাণিক আমার" ইত্যাদি। ছেলে একদিন দুষ্টুমি ক'রে নাপিতের কান কেটে দিলে। নাপিত চেঁচাইতে লাগিল। ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী ছুটে এসে "মাণিক আমার! দুলাল আমার" ব'লে ছেলেকে কোলে নিলেন, আর নাপিতের হাতে কিছু টাকা গুঁজে দিয়ে বিদায় কল্লেন। তার পর ছেলে একটু বড় হ'লে আদর ক'রে তার বিয়ে দিলেন। একদিন ছেলেটি বউকে মিছিমিছি খুব মা'রে। মার খেয়েও কনে বউটী বল্লে,

কিছু দুঃখ নাই মনে, শ্বশুর-নন্দন !
তোমারি প্রসাদে শাঁখা সিন্দূর চন্দন।

একদিন ঘরে ষষ্ঠীব্রত। ছেলে তার মায়ের কাছে গিয়ে বল্লে, মা তেল দাও, * নাইতে যাব। মা হাঁসতে হাঁসতে বল্লেন, না বাছা, ষষ্ঠীব্রতের দিনে কি গায়ে তেল মাখতে আছে? খুড়ী, জেঠাই, মাসী, পিশি সবাই মিষ্টি কথায় তাই বল্লে। তখন ছেলে মনে কল্লে, অন্ততঃ শ্বশুর বাড়ীতে আমার কথা অবহেলা কত্তে কারু সাধ্য হবে না। এই ভেবে, সে ছুটে শ্বশুর বাড়ীতে চ'লে গেল। সেখানে জামাই আদর; শুধু মিষ্টি কথায় মন ভুলানো নয়, দেখবার, শোনবার, খাবার সবাতেই মিষ্টি। জামাই বল্লে, আমি নাইতে যাবো, তেল দাও। সুন্দরী শ্যালীরা তার চা'ন্দিকে ব'সে হেঁসে হেঁসে বল্লে, তুমি হঠাৎ এসেছ, রান্নার এখনো ঢের দেরী; তুমি ততক্ষণ একটু জল খাও। এই ব'লে কেউ আমের থালা, সন্দেশের থালা, কেউ পায়েস ও ক্ষীরের বাটী ইত্যাদি, কত নাম বলি, এই সব এনে জামাইকে ঘিরে বসলো। জামাই বল্লে, আমি না নেয়ে কিছুই খাব না। তখন শ্যালীরা তেলের বদলে তেলের বাটিতে ক'রে মধু এনে দিলে। তাই মাথায় দিয়ে জামাই ভাবলেন, আহা! শ্বশুর বাড়ীর তেলটুকও মিষ্টি! বেগতিক দেখে "মধুর পুরী" ত্যাগ ক'রে ছেলে এক দৌড়ে কলুর বাড়ী গিয়ে তার ভাঁড় ভেঙ্গে গায়ে তেল মাখলে। তেল মেখেই

---

* পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ষষ্ঠীব্রতের দিন তৈল গ্রহণ ও আমিষ ভক্ষণ নিষিদ্ধ। পরবর্ত্তী ব্রত কথায় (মুলোষষ্ঠী) আমিষ-বিভ্রাট বর্ণিত হইয়াছে।

ছেলে একেবারে ছুটে মা ষষ্ঠীর কাছে উপস্থিত। ষষ্ঠীঠাকৃরুণ আশ্চর্য্য হয়ে বল্লেন, বাছা হঠাৎ এলে কেন? ছেলে গায়ে তেল দেখালে। ষষ্ঠী বল্লেন, তোমার মা, খুড়ী, জেঠাই, মাসী পিশি, শাশুরী, শ্যালীরা কেউ ইচ্ছা ক'রে তোমায় আজ তেল দেয়নি। তুমি নিজেই জোর ক'রে কলুর ভাঁড় ভেঙ্গে তেল মেখেছ। কাজ ভাল হয়নি, এতে ওদের দোষ কি? তুমি এখনি ফিরে যাও। ছেলে তখন স্নান ক'রে বাড়ী গেল। সেই থেকে বাবাজীর মতি ফিরিল। বিদ্যে হলো, বুদ্ধি হলো। ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী ছেলে, নাতি, নাতনী নিয়ে পরম সুখে ঘরকন্না কত্তে লাগলেন।

প্রণাম। জয়দেবি জগন্মাত র্জ্জগদানন্দ কারিণি।
প্রসীদ মে কল্যাণি নমস্তে ষষ্ঠীদেবিকে॥

ষষ্ঠীদেবীকে প্রণাম জ্ঞাপনের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বোক্ত নোড়া ললাটে ও বক্ষে স্পর্শ করিতে হয়।

এ ব্রত কল্লে কি হয়?

হয়ে পুত্র মরবে না।
চোকের জল পড়বে না॥

মূলা-ষষ্ঠী ব্রত।

অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লষষ্ঠী তিথিতে মূলোষষ্ঠীব্রত করিতে হয়। নিরামিষ আহারের গৌরব প্রকটিত করা অন্যতম উদ্দেশ্য বলিয়া বোধ হয়। পক্ক আম্রফল নৈবেদ্যের প্রধান উপকরণ বলিয়া জ্যৈষ্ঠ মাসের অরণ্যষষ্ঠীব্রতের অপরনাম আমষষ্ঠী। তদ্রূপ, শীতকাল-সুলভ (অথচ মাঘ মাসে নিষিদ্ধ) মূলক তরকারির অগ্রহায়ণে প্রথম আবির্ভাব বলিয়া উহা অতি সমাদরে নিবেদন করা যায়, এই জন্য এই ব্রতের ঐরূপ নামকরণ। ইহার অপর নাম "ছয় আনাজের ষষ্ঠী"। ব্রতচারিণী সধবাগণও এ দিন ছয় আনাজের নিরামিষ ব্যঞ্জন আহার করেন। ছয় আনাজের মধ্যে মূলা সর্ব্বপ্রধান। অন্য পাঁচটী তরকারি সম্বন্ধে বিশেষ নিয়ম নাই। সাধারণতঃ গোল আলু, রাঙ্গা আলু, বেগুণ, মিঠে কুমড়ো, সিম, পটোল, ঝিঙ্গে, উচ্ছে, কপি, কড়াইশুঁটি এতন্মধ্যে যে কোন পাঁচটী লইবে। আনাজ কুটিয়া বাটনা বাঁটিয়া পূজার কাছে দিতে হয়। আলিপনা, পূজা ও অন্য নৈবেদ্যাদি অরণ্যষষ্ঠীর ন্যায়। কেবল দুর্ব্বার আটি ও পাখা লইতে হয় না। কিন্তু নোড়ার উপর দুর্ব্বা দ্বারা 'ষাট বাছা' তন্ত্র মন্ত্র অরণ্যষষ্ঠীর মত। আর একটী বিশেষ প্রভেদ এই যে পিটুলির দ্বারা ক্ষুদ্র গাই ও বাছুরের পুতুল গড়িতে হয়। যত জন ব্রত করিবেন ততটী গাই ও ততটী বাছুর গড়িবে। হলুদ, চুণ ও মশলা সংযোগে সাদা, হলদে, লাল প্রভৃতি নানা রঙ্গের পুতুল গড়িবে। পূজান্তে প্রত্যেকে একটী গাই ও একটী বাছুর হাতে লইয়া ব্রত কথা শুনিবে। পরে ছেলেরা ঐ পুতুল দ্বারা খেলা করে।

মূলা-ষষ্ঠীব্রত কথা।

এক ছিলেন ব্রাহ্মণ। তাঁর মাংস খেতে সাধ গেল। এক দিন কোত্থেকে এক হাঁস নিয়ে এসে ব্রাহ্মণীকে বল্লেন, আমার মাংস খেতে ইচ্ছে হয়েছে, আমায় রেঁধে দাও। আর তুমি না পার, বউমাকে বল, সেই রেঁধে দিবে। তার বাপেরা বড় লোক, কত দেখেছে শুনেছে ও ভাল রান্না জানে। বউ মাংস রেঁধে বাড়ীর দাসীকে বল্লে, ঝি, ঠাকুর এত সাধ ক'রে খাবেন, তুই একটু চেকে দেখ, কেমন রান্না হয়েছে। আমার সকল সময় নুন আন্দাজি ঠিক হয় না। দাসী কোন দিন মাংস খায়নি; তার বড় লোভ হলো। সে খানিকটা খেয়ে বল্লে, যে গরম দিয়েছ কিছু স্বাদ পেলুম না; আর একটু দাও দেখি। আবার মাংস চেকে বল্লে, হাঁ হয়েছে, তবু যেন কেমন একটু লাগছে; আবার দাও দেখি। বেশী করে দাও, ঠাওরাতে পাচ্ছিনে। লোভে ঝির নোলা সগবগিয়ে উঠেছে, এম্নি ক'রে চাক্‌তে চাক্‌তে হাঁড়ির মাংস ফুরিয়ে গেল। বউ বল্লে, ঝি তুই কি কল্লি, সব মাংস খেয়ে ফেল্লি! কি হবে! তুই শীগগির দৌড়ে যা, আর একটা হাঁস যদি পাস্ তবে তোকে পুরস্কার দেবো, আমি দাম দিচ্ছি। ঝি ভয়ে ও পুরস্কারের লোভে হাঁস না পেয়ে, অবশেষে পাড়ার গেরস্তদের একটা আধ-মরা রোগা বাছুর ছিল, তাই লুকিয়ে কেটে বউকে মাংস এনে দিলে। মাংস কিছুতেই সিদ্ধ হয় না। বউ বল্লে, ঝি, কি মাংস আন্‌লি, সেদ্ধ হয় না কেন? তোর বুকের পাটা তো কম নয়। ঝি থতমত খেয়ে বল্লে, সে কি কথা গো, হাঁসের মাংস চিন্তে পার

না? তোমরা রাঁধতে জান বটে, কিন্তু মাংস চেন না। এই বলে সে লুকিয়ে কতকগুলি পেঁয়াজ বেটে হাঁড়িতে ফেলে দিলে। পেঁয়াজের গন্ধে বউ তিষ্ঠাতে পারেন না। ভাবলেন পেঁয়াজ দিয়েছে, সর্ব্বনাশ হয়েছে! আর কি মাংস আন্‌লে তাও তো বুঝতে পাচ্ছি না। কিন্তু কা'কে বলি, একথা কারু কাছে বলবার নয়, শোনবারও নয়। অনেক ভেবে চিন্তে বউ ঠিক কল্লেন, খাবার জায়গা পিছল করে রাখি, পরিবেশন কয়বার সময় আমি আছাড় খেয়ে পড়বো, আমার যেন দাঁত কপাটি লেগেছে কথা কইব না। লোকজন রান্নাঘরে ঢুকবে, তবেই হেঁসেলের হাঁড়ি কুড়ি সব নষ্ট হয়ে যাবে, ঠাকুরের খাওয়া হবে না। তবেই যদি ব্রাহ্মণের জাত রক্ষা কত্তে পারি, আর উপায় দেখি না। যা ভাবলেন তাই কল্লেন। ভাতের থালা হাতে ক'রে হঠাৎ পড়ে গেলেন, কথা কইতে পারেন না। পাড়ার লোকে রান্নাঘর ভ'রে গেল। ব্রাহ্মণের খাওয়া হলো না। জাত রক্ষা হলো। তারপর বউ সুস্থ হয়ে উঠলেন। শ্বশুরের প্রশ্নে মিছে কথা বলা যায় না। বউ ঝির উপর সন্দেহের কথা প্রকাশ কল্লেন, আর জাত রক্ষার জন্যে যা যা করেছিলেন সব বল্লেন। তখনি খোঁজ খবর করাতে দাসীর বাছুর কাটার কথা প্রকাশ হয়ে পড়লো। তা শুনে সকলের মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়লো। সে দিন অগ্রাণ মাসের শুক্লষষ্ঠী। বউ ছেলে বেলা হ'তে ষষ্ঠীব্রত করতেন। ব্রত ক'রে পূজার জল দূর্ব্বা যেখানে বাছুরের হাড়-গোড় ছিল তার উপরে ছড়িয়ে দিলেন। তখনই মরা বাছুর বেঁচে উঠলো। সকলে অবাক হয়ে গেল। ব্রাহ্মণ ভাবলেন, বউ তো নয়, স্বয়ং লক্ষ্মী!

তখন ব্রাহ্মণ সোণার ষষ্ঠী গড়িয়ে মুক্তার হার পরিয়ে ষোড়শোপ-চারে পূজা করলেন। সে দিন তিনি নিরামিষ আহার ক'রে পৃথিবীতে প্রচার ক'রে দিলেন, ষষ্ঠীব্রতের দিন মাংস দূরে থাক কেউ মাছও যেন না খায়। এই ব্রত যে করবে সে পুত্রকন্যা নিয়ে পরম সুখে কালযাপন করবে। *

প্রণাম। জয়দেবি জগন্মাতঃ ইত্যাদি।

নাগ পঞ্চমী ব্রত।

শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণা পঞ্চমীতে এই ব্রত করণীয়। বর্ষা সমাগমে সর্পগণ ক্ষেত্র ও অরণ্যের বিবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক লোকালয়ে বাস করিতে অগ্রসর হইয়া থাকে। চোর অগ্নি ও ব্যাঘ্রভয় প্রভৃতি বিপদে সতর্কতা অবলম্বন বরং সুসাধ্য। কিন্তু একমাত্র মনসাদেবীর কৃপা ভিন্ন সর্পভয় হইতে মুক্তিলাভের গত্যন্তর নাই। এক শ্রাবণ মাসেই নিম্নবঙ্গে সর্পদংশনে অধি-কাংশ অকালমৃত্যু সজ্ঘটিত হইয়া থাকে। সুতরাং এই সময় গ্রামবাসীদিগকে অতিশয় শঙ্কিত অবস্থায় কালযাপন করিতে হয়। পল্লিবাসিনীগণ শাস্ত্রবিহিত কৃষ্ণা পঞ্চমীতে একবার মাত্র ব্রত করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। তাঁহারা ভীতি-সঙ্কুল শ্রাবণের আদি এবং অন্তেও (আষাঢ় ও শ্রাবণ সংক্রান্তি দ্বয়ে)

---

* আশা করা যায় উপরোক্ত ব্রত কথা পাঠ করিয়া অন্ততঃ দু'একটী উচ্ছৃঙ্খল হিন্দু যুবক "হোটেল" বা মাংস-বিপণির আহার স্পৃহা সংযত করিতে চেষ্টা করিবেন।

বিষহরী মনসাদেবীর অর্চ্চনা করেন। সুগৃহিণীগণ রাত্রে শয্যায় নিদ্রার পূর্ব্বে মিলিত-করতলদ্বয়ের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ঘন ঘন ললাট স্পর্শ পূর্ব্বক "আস্তীকস্য মুনের্মাতা" মনসাদেবীকে নমস্কার জ্ঞাপন করিয়া চক্ষু নিমীলিত করেন। প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গের পর তাঁহারা "দুর্গা দুর্গা" অক্ষরদ্বয় [illegible] করিয়া কৃতজ্ঞতা স্বীকার পূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিয়া থাকেন। শ্রাবণ মাসে ইতর সমাজেও পদ্মাপুরাণ বর্ণিত বেহুলা সতীর উপাখ্যান খোল ও করতাল সংযোগে পল্লি-সমূহ মুখরিত করিয়া তুলে। শ্রাবণের সংক্রান্তি দিবসে জলপ্লাবিত গ্রাম্যবর্ত্মে নৌকার বাইচ এক অপরূপ দৃশ্য। নৌকার গলুই উপরি স্থাপিত মৃণ্ময় অষ্টনাগমূর্ত্তি বহন করিয়া শত শত তরি অবারিত জলপথে "তীর তারা উল্কা ও বায়ুর" সঙ্গে যেন প্রতিযোগিতা করিয়া প্রধাবিত হইয়া থাকে।

ব্রতের দিন অন্নাহার নিষেধ। মনসা পূজায় কাঁচা দুধ ও পাঁচটী কলা নৈবেদ্যের প্রধান উপকরণ। মনসার পূজায় ধুনা দিতে নাই। ধ্যান যথা ;

ওঁ দেবীমম্বা মহীনাং শশধরবদনাং চারুকান্তিং বদন্যাং,
হংসারূঢ়ামুদারাং সুললিতনয়নাং সেবিতাং সিদ্ধিকামৈঃ।
স্মেরাস্যাং মণ্ডিতাঙ্গীং কণকমণিগণৈঃ নাগরত্নৈরনেকৈঃ,
বন্দেঽহং সাষ্টনাগাং উরুকুচযুগলাং ভোগিনীং কামরূপাং।

নাগ পঞ্চমীব্রত কথা।

এক ব্রাহ্মণী ; তাঁর তিনপুত্র ও তিন পুত্র-বধূ। শ্রাবণ মাস, বৃষ্টি পড়চে। বৌয়েরা পুকুরে স্নান কত্তে যাচ্ছিলেন। ছোট বউকে শুনিয়ে, বড় বউ বল্লেন, আজ "হেন দিনে,

বাপের বাড়ী হলে বেশ ক'রে খিচুড়ি খাওয়া যেতো। মেজো বউ বল্লেন, আজ হেন দিনে বাপের বাড়ীতে ঘি মেখে চা'ল কড়াই ভাজা, কাঁটাল বীচি ভাজা, আর গরম গরম লুচি খেতুম। ছোট বউ জা-দের বাপের বাড়ীর বড়াই শু'নে চুপ ক'রে রইলেন। তাঁরা বল্লেন, ছোট বউ, তুমি কিছু বল্লে না? দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে ছোট বউ বল্লেন, বাপের বাড়ীতে "সেজনের" (অর্থাৎ "আমার"। ৩ পৃষ্ঠার নিম্নে টীকা দেখ।) আর কে আছে! বড় দুই ভাই ছিল, তাদেরও মা মনসা নিয়েছেন। শুনেছি, ছেলে বেলায় সর্পাঘাতে তারা মারা গেছে। বৃষ্টি বাদলার দিনে তোমাদের যদি ভাল খেতে এতই সাধ, তবে এখানেই কি আজ ঠাকুরুণকে ব'লে খিচুড়ী আর ভাজাভুজি হ'তে পারে না? তোমরা নেয়ে ঘরে যাও; আমি দেখি যদি পারি পুকুর থেকে দুটি মাচ নিয়ে গিয়ে তোমাদের খাওয়াব। বড় বউ বল্লেন, এখানকার এ ডোবাটার ভেতর আর কি পাবে। আমার বাপের বাড়ীতে বাইরের দুটী পুকুরে বড় বড় রুই, কাতলা, ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু বল্লে বিশ্বাস করবে না, আমাদের খিড়কীর পুকুরে প্রায় এক হাত লম্বা কই মাচ যে কত, তা আর কি বলবো; আর আঃ, তার স্বাদই বা কি! মেজ বউও গরব ক'রে ঐরূপ একটা কিছু বল্লেন।

বড় ও মেজো নেয়ে চলে গেল পরে, ছোট বউ দেখলেন, দুটো শোল মাচ জলে ভেসে বেড়াচ্চে। তিনি তাই ধরে নিয়ে গিয়ে হেঁসেলে গামলা ঢাকা দিয়ে রাখলেন। তারপর গামলা তুলে দেখেন, শোল মাচ ত নয়, দুটা সাপ! তাঁর গা শিউরে উঠলো। তখন সাপ দুটী সুন্দর মানুষের মুর্ত্তি ধরে বল্লে, বোন

আমাদের নাম এয়োরাজ ও মুনিরাজ, আমরা তোমার দাদা। মা মনসার কাছে আমরা পরম সুখে আছি। তুমি তোমার জা-দের বাপের বাড়ীর বড়াই শুনে মুখ ছোট করে থাক, তাতে আমাদের মনে বড় দুঃখ হয়; চল তোমাকে নিয়ে মা মনসার কাছে যাই, আবার দিন সাতেক পরেই তোমাকে এখানে রেখে যাব। এই ব'লে তাঁরা ভগিনীর শাশুরীর কাছে গিয়ে তাকে বাপের বাড়ী নে যাবার প্রস্তাব কল্লেন। ব্রাহ্মণী বল্লেন, সে কি কথা গো; ছোট বৌয়ের বাপের বাড়ীতে তার ভেয়েরা আছে তা তো আগে জানতুম না। এয়োরাজ ও মুনিরাজ বল্লেন, আমরা ছোট বেলায় বিদেশে গেছনুম সেখানে আমাদের সর্পাঘাত হয়েছিল বটে, কিন্তু মা মনসার বরে বেঁচেই আছি।

ভেয়েরা ছোট বউকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে সাত সমুদ্র পার হ'য়ে এক মহা অরণ্যে প্রবেশ কল্লেন। তারপর মা মনসা ঠাকরুণের বাড়ীতে পঁহুছিলেন। সেখানে বাড়ীর মেয়ের মত ছোট বউয়ের পরম সমাদর। আজ খিচুড়ী, কাল মাংস, তারপর নানারকম ভাজা, গরম গরম লুচি ছোট বউ রোজ আহার কত্তে লাগলেন। একদিন মনসা ঠাকরুণ 'ছোট বউ'কে আদর ক'রে বল্লেন, মা আজ নাগপঞ্চমী, আমি মর্ত্ত্যে পূজার নেমতন্নে যাচ্ছি, তুমিই আমার হয়ে রান্নার উয্যুগ সুয্যুগ ক'রে ভেয়েদের খাওয়াবে, আর নাগেদের দুধ খেতে দিবে। নাগেরা অবুঝ ছেলে, অল্পেতেই রেগে উঠে; দেখো, তাদের যেন কোন বিষয়ে ত্রুটী না হয়। তাই শুনে আমাদের ছোট বউ বল্লেন, মা তোমার কোন চিন্তা নাই, আমি সব করবো। মনসা দেবী মর্ত্ত্যে চ'লে গেলেন।

শ্রাবণ মাস বৃষ্টির দিন। গরম গরম খাওয়া ভাল, এই মনে ক'রে ছোট বউ দুধ জ্বাল দিয়ে খুব গরম থাকতেই নাগেদের গর্ত্তে ঢেলে দিলেন। * হিতে বিপরীত হলো। গরম দুধ লেগে নাগেদের কারুর মুখ, কারুর ঠোঁট, কারও বা সর্ব্বাঙ্গ পুড়ে গেল। দারুণ রাগে নাগেরা গর্জ্জিয়া উঠিল। কি, আমরা হলুম কদ্রু-সন্তান নাগ, কোত্থেকে এক সামান্য মানবকন্যা এসে কি-না আমাদের অপমান করবে! এয়োরাজ ও মুনিরাজ আস্তীককে সঙ্গে ক'রে বাসুকি মামাকে ব'লে ক'য়ে নাগেদের শান্ত কত্তে চেষ্টা কল্লেন। কিন্তু গোখরো ও বোড়া নাগের রাগ কিছুতেই থামিল না। তারা তেড়ে গিয়ে মানবকন্যার বাঁ হাতে ও বাঁ পায়ে দংশন কল্লে। ছোট বউ ঢ'লে পড়্‌লো। মনসা ঠাকরুণ ফিরে এসে দেখলেন, প্রমাদ হয়েছে। তিনি বল্লেন, আমি তখনি মনে করেছিলুম দেবে মানবে একঠাঁই হলে একটা কিছু না বেধে যাবে না। আমি মানবকন্যাটীর তো কোন দোষ দেখতে পাচ্ছিনে; ভাল কত্তে গিয়েই এর মন্দ হলো। মা মনসার আশীর্ব্বাদে তখন ছোট বউ বেঁচে উঠলো। মনসাদেবীর প্রতি তাঁর অচলা ভক্তি হলো। দেবী এয়োরাজ ও মুনিরাজকে আগেকার প্রাণ দান কল্লেন ও বল্লেন, তোমরা ভগিনীকে নিয়ে তোমাদের বাড়ী যাও। এই ব'লে ছোট বউকে গা-ভরা গহনা ও তার দুই ভাইকে ধন রত্ন দিয়ে বিদায় কল্লেন।

এয়োরাজ ও মুনিরাজ বাড়ী এসে ঘর দো'র দুরস্ত ক'রে, ভগিনীকে অনেক জিনিষ পত্র সঙ্গে দিয়ে তার শ্বশুর বা'ড়ী

* এই কল্পিত ঘটনা হইতেই বোধ হয় বিষহরী মনসার পূজায় কাঁচা দুধ দেওয়ার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

পাঠিয়ে দিলেন। ব্রাহ্মণী এত গহনা ও জিনিষ দেখে আশ্চর্য্য হলেন। বড় বৌ ও মেজ বৌয়ের যেন একটু হিংস্রা হলো। ছোট বউয়ের গা-ভরা গহনা। কিন্তু সর্পাঘাতের ঘা এখনো ভালরূপে শুকোয় নাই, এই জন্যে তিনি বাঁ হাতের ও বাঁ পায়ের বালা ও মল খুলে রেখেছেন। তাই দেখে, ছোট বউকে শুনিয়ে, বড় ও মেজ বউ বলাবলি কোরচেন, আধ-অঙ্গে গহনা পরেই এত ঝম্ ঝম্, সর্ব্বাঙ্গে পরলে এ বাড়ীতে তিষ্ঠানো ভার হবে। তাই শুনে, হঠাৎ কোত্থেকে একটা সাপ এসে ফোঁস করে মাথা তুলে বড় বৌ ও মেজ বৌয়ের দিকে চেয়ে বল্লে;

পরের মন্দে ভাল যে করে,
ভাতে পুতে সে বাড়ে।
পরের ভালোয় মন্দ যে করে,
ভষ্ম হয়ে সে মরে।

সেই দিন থেকে ছোট বউয়ের সঙ্গে বড় বউ ও মেজ বউয়ের ভয়ে ভয়ে খুব ভাব হয়ে গেল।

কিছু কাল পর, এয়োরাজ ও মুনিরাজ আবার ভগিনীকে তাদের বাড়ীতে নিয়ে যেতে লোক পাঠাইলেন। তখন ছোট বৌয়ের সন্তান সম্ভাবনা। বড় মানুষ কুটুম, আর প্রথম সন্তান পিত্রালয়ে হওয়াই ভাল, এই মনে ক'রে ব্রাহ্মণী বউকে যেতে দিলেন।

যথা সময়ে ছোট বউয়ের এক পরম সুন্দর পুত্র সন্তান হলো। এয়োরাজ ও মুনিরাজ খুব সমারোহ ক'রে ভাগ্নের অন্নপ্রাশন দিলেন। ছেলের ভাতের নিমন্ত্রণ পেয়ে ছেলের বাপ, জেঠারা ঠাকুরমা ও জেঠাইরা ছেলের মামা বাড়ী এলেন। সেখানে খুব

ঘটাঘটি হলো। সন্দেশের ছড়াছড়ি, দইয়ের কাদা। রোজ ৫০ মণ খরচ। ছোট বউ জা-দের যারপর নাই সমাদর কল্লেন। বড় কই মাচের জন্যে অনেক চেষ্টা কল্লেন, শেষে বড় বৌয়ের বাপের বাড়ীর খিড়কির পুকুরেও লোক পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু ছোট বৌয়ের মনে একটা বড় দুঃখ রয়ে গেল, এক হাত লম্বা কই মৎস্য কোথাও পাওয়া গেল না!

এই ব্রত যে করে, মা মনসা জলে জঙ্গলে তার ছেলে পুলে রক্ষা করেন। চিরকাল সুখে যায়।

প্রণাম। আস্তীকস্য মুনের্মাতা ভগিনী বাসুকে স্তথা
জরৎকারু মুনেঃ পত্নী মনসাদেবি নমোস্তুতে।

গাড়শী ব্রত।

আশ্বিন মাসের সংক্রান্তি দিবস গাড়শী ব্রত করিতে হয়। "গাড়শী" শব্দ বোধ হয় "গার্হস্থ্য" শব্দের অপভ্রংশ। রাত্রির চতুর্থ প্রহরে কাক ডাকিবার পূর্ব্বে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া বালক বালিকা সধবা বিধবা সকলেই অন্তঃপুরের প্রাঙ্গনে প্রদীপ জ্বালিয়া সমবেত হইয়া থাকেন। পুষ্করিণী হইতে এক ঘটী জল আনয়ন করিয়া স্থাপন করিবে, এবং কয়েকটী বাঁটা মশলা, যথা, সরিষা, মেথী, হলুদ এবং কুলগাছের নূতন পাতা একখানি রেকাবে রাখিবে। এগুলি পূর্ব্বদিন সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হয়। প্রদীপের শিখার উপর দুই একটী কাঁচা তেঁতুল পোড়াইবে। এই সময় সকলেই (শয্যা হইতে গাত্রোত্থানের

পর বয়স্ক পুরুষদের মধ্যে অনেকের সাধারণ কৃত্য বলিয়া ?) ধূম পান করিবেন। কিন্তু স্ত্রীলোক ও বালক বালিকাগণের ধূম পান প্রথা নাই। এজন্য ইহারা পাট-কাটির (প্যাঁকাটি) এক প্রান্তে আগুন ধরাইয়া অন্যপ্রান্ত চুরুটের ন্যায় টানিয়া দুই এক বার ধূম উদ্গীরণ করেন। বালকগণ ইহাতে বিশেষ আনন্দ

অনুভব করে। এইরূপ অপূর্ব্ব ধূম্র পানের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বয়োবৃদ্ধগণ গম্ভীরভাবে উত্তর প্রদান করেন যে, এতদ্দারা মানবজাতির যাবতীয় কাশির পীড়া আরোগ্য হইয়া যায়।

অতঃপর একবার "জয়কার" উলুধ্বনি করিবে। পুনরায় শয়ন নিয়ম-বিরুদ্ধ হইলেও বালক বালিকাগণ পুনর্ব্বার শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করে; যুবতী ও বৃদ্ধাগণ উষাকালে পূজার জন্য পুষ্প চয়ন করেন। প্রত্যুষে পূর্ব্বাহৃত পুষ্করিণীর জল দ্বারা সকলের মুখ প্রক্ষালন করা বিধি। অনন্তর বালক বালিকা ও সধবাগণ পূর্ব্বোক্ত হলুদ প্রভৃতি মশলা দ্বারা শরীর ম্রক্ষণ করিয়া প্রাতঃস্নান করিয়া থাকেন। চোখে কাজল দেওয়ার প্রথাও আছে।

পূর্ব্বাহ্ণে লক্ষ্মীপূজা হয়। নৈবেদ্যের প্রধান উপকরণ ভিজানো মুগ, মাষ ও বুট। নারিকেলও দেওয়া যায়। সধবাগণও আমিষ আহার করেন না; সকলেই কলাই বা মুগের ডাল ভাত আহার করেন। পরদিন প্রাতঃকালে বালক বালিকা ও সধবাগণের পর্য্যুষিত অন্ন আহার করা বিধি।

আশ্বিনে রাঁধিয়া কার্ত্তিকে খায়,
যে বর মাগে সেই বর পায়।

পূজান্তে কথা শ্রবণ করিতে হয়।

গাড়শী ব্রত কথা।

এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পুত্র ও পুত্রবধূ লইয়া সংসার করেন। বৌটী অতি শুদ্ধাচারিণী। তাঁরই পুণ্যের জোরে ব্রাহ্মণ পরম সুখে আছেন, কিছুই অভাব নাই।

আশ্বিন সংক্রান্তির পূর্ব্ব দিবস ব্রাহ্মণ পুকুরে সন্ধ্যা আহ্নিক করিতে বসিয়াছেন। কিন্তু তাঁর মন অন্যদিকে। এমন সময় অলক্ষ্মী খুব সাজ গোজ ক'রে তার কুরূপ ঢেকে পরম রূপসী বেশে বৃদ্ধ

ব্রাহ্মণকে দর্শন দিল। অলক্ষ্মী বলিল, আমি কা'ল সন্ধ্যার সময় তোমার ঘরে আসবো। কিন্তু তোমার বউটী ভাল নয়। তুমি তাকে সকালে উঠানে গোবর ছড়া দিতে মানা করো; আমি গোবরের দুর্গন্ধ সইতে পারি না। আর ঠিক সাঁজের সময় যেন সে ঘরে প্রদীপ না জ্বালে; আমি তখন লুকিয়ে তোমার ঘরে আসবো। আর তাও বলি, বউটী তোমার মানা শুনে মনে কিছু সন্দেহ বা দুঃখ না করে, এজন্যে কা'ল তাকে বেশী ক'রে মাছের ঝোল ভাত খেতে দিবে। তা যদি কত্তে পার, তবেই আমি তোমার ঘরে আসতে পারবো। নইলে, তুমি আমার আশা ছাড়ো, আর আমিও তোমার আশা ছেড়ে দি। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ রূপে ও মিষ্ট কথায় মোহিত হয়ে গিয়াছেন; ভাল মন্দ বিচার না ক'রে বউকে ঐ সব করিতে বিশেষ ক'রে মানা ক'রে দিলেন। বউ ভাবলেন শ্বশুরের দুর্ম্মতি হয়েছে। তিনি খুব ভোরে উঠে গোবর ছড়া দিলেন, কিন্তু শ্বশুরের ভয়ে আবার ভাল ক'রে ধুয়ে ফেল্লেন। তারপর গাড়শী ব্রত ক'রে সেদিন মুগের ডাল ভাত আহার করলেন। সন্ধ্যা হ'লে ঘরে প্রদীপ জ্বেলে তখনি নিবিয়ে দিলেন। ঠিক সেই সময়ে, সকলে এক বিকট চীৎকার শুনে দৌড়ে গিয়ে দেখতে পেলে একটা অলক্ষ্মী স্ত্রীমূর্ত্তি আঁস্তাকুড়ের পাশে বেহুস হয়ে পড়ে আছে। সকলে তাকে 'অলক্ষ্মী' ব'লে চিন্তে পাল্লে। বেহুঁস অলক্ষ্মীকে দেখে ব্রাহ্মণের চৈতন্য হলো এবং লক্ষ্মীমূর্ত্তি বৌয়ের শুদ্ধাচারেই যে অলক্ষ্মী ঘরে ঢুকতে পারে নাই তাহা তাঁর জানতে আর বাকী রইল না। তিনি বৌয়ের খুব সুখ্যাত কত্তে লাগলেন।

এর নাম গাড়শী ব্রত; যে করে তার ঘরে লক্ষ্মী বাঁধা থাকেন, অলক্ষ্মী ঢুকতে পায় না।

প্রণাম। ওঁ বিশ্বরূপস্য ভার্য্যাসি পদ্মে পদ্মালয়ে শুভে।
সর্ব্বতঃ পাহি মাংদেবি মহালক্ষ্মি নমোঽস্তুতে॥

আশ্বিন-সংক্রান্তির পূর্ব্বেই যদি কোজাগরী পূর্ণিমায় লক্ষ্মী ব্রত হইয়া যায় তবে গাড়শীব্রতে অলক্ষ্মীদেবীর উদ্দেশে পূজা করা বিধি। লক্ষ্মীর উপাসনা না হইয়া গেলে অলক্ষ্মীর অর্চ্চনা হইতে পারে না। অলক্ষ্মীর ধ্যানটী শুনুন।

ওঁ অলক্ষ্মীং কৃষ্ণবর্ণাঞ্চ ক্রোধনাং কলহপ্রিয়াং।
কৃষ্ণবস্ত্র পরিধানাং লৌহাভরণ ভূষিতাং
ভগ্নাসনস্থাং দ্বিভুজাং শর্করাঘৃষ্টচন্দনাং।
সম্মার্জ্জনী সব্যহস্তাং দক্ষহস্তস্থ শূর্পকাং॥
তৈলাভ্যঙ্গিত গাত্রাঞ্চ গর্দ্দভারোহণাং ভজে॥

অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, এমন অলুক্ষণে ঠাকুরুণের ভজনা করাই বা কেন? বোধ হয়, দুষ্ট স্বরস্বতীর ন্যায় দুষ্ট লক্ষ্মী ছলে বলে কৌশলে কাহারও ঘাড়ে না চাপেন এজন্য করযোড়ে ভয়ে ভয়ে যেন বলা হয় "তোমাকে ঠাকুরুণ নমস্কার, তুমি আর এদিকে এসো না।"

শারদীয় কোজাগরী লক্ষ্মীব্রতের দেশব্যাপী অনুষ্ঠান সর্ব্বজন বিদিত। এজন্য বাহুল্য ভয়ে তাহা পৃথকরূপে বিবৃত হইল না। লক্ষ্মীদেবীর অভ্যর্থনার নিমিত্ত কি ভদ্র কি ইতর, গ্রামের সকল গৃহই বিচিত্র আলিপনায় সুশোভিত হইয়া থাকে; বালিকা ও যুবতীগণের আনন্দের সীমা নাই। আর ঘরে স্বয়ং

লক্ষ্মী পদার্পণ করবেন, এজন্য মনের উল্লাসে তাঁহারা সকল গৃহের দ্বারদেশে দেবীর পদাঙ্ক, পেচকমূর্ত্তি ও ধান্যশীর্ষ অঙ্কিত করিয়া চিত্রবিদ্যার নৈপুণ্য প্রকাশ করিতে ব্যস্ত। বর্ষিয়সী গৃহিণীগণ নৈবেদ্য রচনায় নিযুক্তা। চিড়া, মুড়ি, মুড়কি, খই, মোয়া, লাড়ু, নারিকেলজাত বিবিধ মিষ্টান্ন ও সন্দেশ প্রভৃতি "রচনা" দ্বারা আজ গৃহ পরিপূর্ণ। বাড়ীর "সেকেলে" কর্ত্তাগণ লক্ষ্মীর আহ্বান শ্রবণের জন্য উৎকর্ণ হইয়া তাঁহার আগমন প্রতীক্ষায় রাত্রি জাগরণ পূর্ব্বক নিশি পোহাইতেছেন। তন্দ্রা নিবারণের জন্য ঘন ঘন তামাক সেবন ও অক্ষক্রীড়া করিতেছেন। আজ পূর্ণিমা নিশীথে লক্ষ্মী বরদাত্রী হইয়া ঝাঁপিকক্ষে দ্বারে দ্বারে বিচরণ করিয়া ধনরত্ন বিতরণ করিতেছেন। তিনি সকলকে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন "তোমরা কে জেগে আছ, শীঘ্র এস, এই ধন লও। আমি অপেক্ষা করিতে পারি না, আমায় আজ রাত্রে সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন করিতে হইবে।"

নিশীথে বরদালক্ষ্মীঃ কো জাগর্ত্তীতি ভাষিণী।
নারিকেলোদকং পীত্বা অক্ষৈর্জ্জাগরণং নিশি।
তস্মৈ বিত্তং প্রযচ্ছামি কো জাগর্ত্তি মহীতলে॥

কো জাগর্ত্তি? ইহা হইতেই নাম "কোজাগরি"।

ক্ষেত্র ব্রত।

এই ব্রত অগ্রহায়ণ মাসের শুক্ল পক্ষের প্রথম শনিবারে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। পশ্চাদুক্ত "বুড়াঠাকুরাণীর ব্রত"ও এই শনিবারে করিতে হয়।

ক্ষেত্রব্রত কৃষিজীবিদের কল্যাণ কামনায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। কৃষিকর্ম্মের প্রতি কমলার অর্দ্ধদৃষ্টি চিরপ্রসিদ্ধ। একমাত্র শস্যের অভাবে পৃথিবীর অন্য সুখ-সম্পদ বিফল। অগ্রহায়ণ মাস হইতে যোষিৎ প্রচলিত বার-ব্রতাদির গণনা আরম্ভ হয়। অগ্রহায়ণেই ব্রত সংখ্যা বেশী। বিবাহিতা কুলকামিনী অগ্রহায়ণে সর্ব্ব প্রথম ক্ষেত্রব্রতে দীক্ষিতা হইলে তাঁহার অন্যান্য গার্হস্থ্য ব্রতে অধিকার লাভ হয়। ইহা অগ্রে না করিয়া অগ্রহায়ণে কর্ত্তব্য অন্যান্য বারব্রতাদি করা নিষ্ফল। ক্ষেত্রব্রত যদি কোন বৎসর অগ্রহায়ণের শেষভাগে নিরূপিত হয়, তবে অগ্রহায়ণের অন্যান্য ব্রত মাঘমাসে করিবে। শস্যপ্রাচুর্য্য বশতঃ মাতৃভূমি মার্গশীর্ষে নূতন সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত, সুতরাং ক্ষেত্র দেবতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এই উপযুক্ত সময়।

কৃষক নেহাৎ "চাষা" কিম্বা "ভদ্র"? ইহার উত্তরে এখন আর দুই মত হইতে পারে না। কারণ, সম্প্রতি কতিপয় কমলার প্রিয়-পুত্র জমিদার ও বাণী-পুত্র মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত স্বহস্তে একযোগে হলচালনা করিয়া একবাক্যে উক্ত প্রশ্নের সমাধান করিয়া দিয়াছেন। হংস-পুচ্ছ অপেক্ষা লাঙ্গলের গুরুভার দেখিয়া কেহ ভ্রমক্রমে কৃষিকর্ম্মের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ না করেন; এই জন্যই গজেন্দ্র-বদনের অগ্রপূজার ন্যায়, ক্ষেত্রব্রত সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য এইরূপ বিধি প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকিবে।

নূতন ধান্যের প্রস্তুত মুড়ি, মুড়কি, চা'ল ভাজা, ছাতু প্রভৃতি পূজার বিশিষ্ট নৈবেদ্য। একখানি কুলার উপর ছাতু দ্বারা ক্ষেত্র দেবতার মূর্ত্তি রচিত হয়। পুরোহিত ক্ষেত্র-পাল দেবতার

পূজা করেন। গৃহকর্ত্রী অন্নাহার না করিয়া পূজান্তে দধি-দুগ্ধ ফল মূলাদি ভোজন করিবেন।

ক্ষেত্র ব্রত কথা।

এক গরীব চাষীর ছেলে; তার মা বাপ নাই। এজন্যে সে মামার বাড়ীতে থাকতো। মামা ও মামী তাকে ভাল বাসতেন না। ছেলেটাকে মামাদের ক্ষেতে সারাদিন দা, কোদাল ও লাঙ্গল নিয়ে খুব খাটতে হতো। বাড়ীতে ফিরে এলেও দা ও কোদাল রেখে তার একটুও বিশ্রাম করবার সময় হতো না। পাড়া পড়শীরা এজন্যে তাকে "দা-কোদালে" ব'লে ডাকতো। "দা-কোদালে" বালক হলেও ক্ষেত্র দেবতার বিশেষ ভক্ত ছিল। তারই পুণ্যের জোরে তার মামার ক্ষেত-ভরা ফসল জন্মাতো। কিন্তু এত যে খাটুনি তবু সে কোন দিন পেট পুরে খেতে পেতো না। আধপেটা খেয়ে থাকতো। ক্ষুধার সময় কিছু চিড়ে, মুড়ি, ছাতু পেলেও অর্দ্ধেক ক্ষেত্রদেবতাকে নিবেদন ক'রে বাকী টুকু নিজে খেতো। মামার গোয়াল ভরা গোরু, গাল ভরা মোষ; ঘরে দই, দুধ, ক্ষীর সর অনেক। ছেলে মানুষ, বিশেষ বুদ্ধি শুদ্ধি নাই; সে একদিন ঘরে বেশী দুধের সর দেখে একটু খেতে চাইলে। মামী বল্লে, হতভাগা ছেলে কোথাকার, তোর জন্যে কি আর ঘরে দুধের সর রাখতে পারবো না। রোজগার নাই, সর খেতে চাওয়া, কি আমার কেষ্ট ঠাকুর গো!

দা-কোদালের মনে বড় দুঃখ হলো। ক্ষেত্র দেবতা ভাবলেন, এই ছেলেটী ছাড়া আর কেউ আমার ভক্তি করে না।

বালকের ভক্তি দেখে, তিনি তাকে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে দেখা দিয়ে বল্লেন, বাছা, আমার কথা শোন। আর পরের গোলামী করা কেন; যাও তুমি এখনি তোমার মামার বাড়ী ত্যাগ ক'রে অই যে খুব দূরে এক প্রকাণ্ড মাঠ দেখতে পাচ্ছ সেইখানে কুঁড়েঘর ক'রে চাষ-বাস করগে। তোমার দুঃখ দূর হবে। দা-কোদালে তাই কল্লে। তার পর অগ্রহায়ণ মাস শনিবার, সে ভোরে উঠে দেখলে, তার ক্ষেতে ধান তো নয়, সবই সোণা! ক্ষেত্র দেবতার কৃপায় তখনই তার কুঁড়েঘর রাজ অট্টালিকা হয়ে গেল। দা-কোদালে রাজা হলেন, অট্টালিকায় রাজার হালে বাস কত্তে লাগলেন। তাঁর এখন ঐশ্বর্য্যের সীমা নাই।

এদিকে, ভাগনে চ'লে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই লক্ষ্মী মামাদের ঘর ত্যাগ কল্লেন। তারা ভাতের কাঙ্গাল হয়ে পড়লো। ক্ষেত্র দেবতার কোপে দেশে দারুণ দুর্ভিক্ষ ও জলকষ্ট হলো। দা-কোদালে এখন বড়লোক হলেও গরীবের প্রতি তাঁর বড় দয়া। তিনি অনেক পুকুর কাটাতে লাগলেন। যারা মজুরী কত্তে আসতো তাদের অকাতরে অন্ন দান করতেন। খেতে না পেয়ে তাঁর মামা মামীও অন্নসত্রে এসেছিল। তারা কোদাল হাতে ক'রে পুকুরের কাজে যাবে এমন সময়ে দা-কোদালে তাদের দেখে চিনতে পেয়ে চাকর-বাকরদের হুকুম দিলেন, শীগগির ঐ পুরুষ ও স্ত্রীলোক মজুর দু'টীকে স্নান করিয়ে নূতন কাপড় পরিয়ে বাড়ীর ভেতর নিয়ে এস। মামা ও মামী ভয়ে অস্থির। রাজার পুকুরে কি জল হচ্ছে না? রাজ বাড়ীতে তো কালীবলির নাই? তাদের মুখ শুকিয়ে গেল। মামা ও মামীকে স্নান

ক'রে একত্র আহার করবেন মনে ক'রে দা-কোদালে খাবার ঘরে তিনটী জায়গা করালেন। পঞ্চাশ ব্যঞ্জন ভাত দেখে মামা ও মামীর চক্ষু স্থির। তার পর রাজা এলেন। "ওঃ হরি! 'রাজা' তো নয়, আমাদের সেই দা-কোদালে!" এই ব'লে মামা ও মামীর যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো। তাদের তখন আহ্লাদের সীমা নাই।

মামা রাজসংসারের কর্ত্তা হলেন। দা-কোদালের এখন আদর যত্ন কত! এটা খাও, ওটা খাও ব'লে মামী ভাগনেকে কেবলি দু'বেলা দই দুধ ক্ষীর সন্দেশ ও দুধের সর খাওয়াতেন। খাব না বল্লেও ছাড়েন না। একদিন বেশী দুধের সর দেখে দা-কোদালে মামীকে রহস্য করে বল্লেন,

সেই মামা সেই মামী পুকুর পাড়ে ঘর।
এখন কেন মামা মামী দুধে এত সর॥

মামী লজ্জিত হলেন। তার পর দা-কোদালে এক রাজকন্যা বিবাহ কল্লেন। তাঁরা ক্ষেত্র দেবতার ব্রত পৃথিবীতে প্রচার কল্লেন। এ ব্রত কল্লে ক্ষেতে ধান হয়, ধন জন হয়, দেশে দুর্ভিক্ষ হয় না।

প্রণাম। ক্ষেত্রপাল নমস্তভ্যং হলধরং বরপ্রদং।
ঈতি-ভয় হরংদেবং ত্বাং সদা প্রণমাম্যহং॥

বুড়াঠাকুরাণী ব্রত।

ক্ষেত্র ও "বুড়াঠাকুরাণী" ব্রত এক দিনেই কর্ত্তব্য। রমণীদের বিশ্বাস, এ দুইটী ব্রত না করিলে অন্যান্য বারব্রতের অনুষ্ঠান নিষ্ফল।

বুড়া ঠাকুরাণী বা বনদেবী মহাদেবের প্রিয় কন্যা। বনে ইহার অধিষ্ঠান। এজন্য অন্তঃপুরের প্রাঙ্গণে সেওড়া ও জবা-ফুলের গাছের ক্ষুদ্র শাখা পুঁতিয়া কল্পনার সাহায্যে অরণ্য সৃজন করিতে হয়। একটী "পুকুর" খনন করিয়া উহার চতুঃপার্শ্বে পিটুলি গুলিয়া আলিপনা দিবে। কদলীপত্রের ডাঁট ৯।১০ অঙ্গুলী পরিমাণে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া লইবে। অতঃপর সাদা হল্‌দে ও লাল এই তিন রঙ্গের পিটুলি জলে না গুলিয়া তদ্দ্বারা অর্দ্ধবৃত্তাকারে শাঁখা গঠন পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত এক খণ্ড কলা পাতার ডাঁটের উপর স্থাপন করিবে। শাঁখার জমিন সাদা, ও দুই দিকে লাল ও হল্‌দে পাড়। এইরূপ দুইটী বা এক জোড়া শাঁখা একটী ডাঁটের উপর রাখিবে। ব্রতিনীগণ প্রত্যেকে এক জোড়া শাঁখা হাতে তুলিয়া কথা শ্রবণ করিবেন। তৎপর লাল পিটুলি জলে গুলিয়া কতকটা উক্ত সেওড়া ও জবার ডালের গোড়ায় ও বাকীটুকু "পুকুরে" ঢালিয়া দিবে।

পুরোহিত বনদুর্গার পূজা করিয়া থাকেন। নৈবেদ্যের প্রধান উপকরণ দই, দুধ, কলা এবং কলাপাতার উপর রক্ষিত মুড়ি, মুড়কি, মোয়া, ছাতু, লাড়ু ইত্যাদি।

বুড়াঠাকুরাণী-ব্রত কথা।

পার্ব্বতী দুঃখ ক'রে মহাদেবকে বোল্‌চেন, তুমি দু'দিন যাবৎ ভিক্ষা করতে বেরোও নাই; এমনি ক'রে বসে থাকলে সংসার চল্‌বে কিরূপে? মনে করেছিলেম তোমাকে কিছু বলবো না; না বল্লেই বা কি করি। বাপের বাড়ীর গহনা-গাঁটী যা ছিল তা দিয়েই এদ্দিন কুটে শ্রেটে চালিয়েছি। শাঁখা পরবার সাধ

ছিল, তাই তুমি এ পর্য্যন্ত দিতে পাল্লে না। তা মরুক গে, এখন এদিকে ঘরে চা'ল নাই, ডাল নাই, তোমাকে কি খাওয়াব আর ছেলে দু'টীর মুখেই বা কি দি। অপরে আমার সামনে তোমার নিন্দে করে তা আমি প্রাণ থাকতে সইতে পারবো না; কিন্তু নিজে দু-টা কথা না ব'লেও পারি না। কি সুখে আছি তা কা'কে বলি। ছেলে দু'টী মানুষ হ'লে ভাবনা ছিল না। গণেশকে তুমি নিজের যুগ্যি ক'রে তুলেছ, সে সিদ্ধি দিচ্ছে আর তুমি তাই খাচ্ছ। আর ছোটটী কেবল ময়ূর চ'ড়ে বেড়াচ্ছে। স্বামী পুত্র আমার কষ্ট বুঝলে না। একটী মেয়ে থাকতো তবে মনের কষ্ট বুঝতে পারতো। এই ব'লে পার্ব্বতী চোকে আঁচল দিয়ে নীরবে কাঁদতে লাগলেন।

তা' শুনে মহাদেব বোলচেন, গৌরি, কৈলাসে কিছু অভাব আছে? চা'দ্দিকে যা দেখচো সবই তো আমার। পার্ব্বতী বোলচেন, যা কিছু অভাব, অন্নবস্ত্রের। তুমি বাঘছাল পর, বিষ খাও, যা ইচ্ছে তাই কর; ছেলে দু'টীকে নিয়ে আমি আজই বাপের বাড়ী চলে যাব। এই ব'লে তিনি হিমালয়ে চলে গেলেন।

কৈলাসে কোন অভাব নাই; কিন্তু এক পার্ব্বতীর অভাবে মহাদেবের চা'দ্দিক শূন্য বোধ হ'তে লাগলো। কিন্তু বিনা নিমন্ত্রণে শ্বশুর বাড়ী যাওয়া অপমান। আর গিরিরাজের অন্তঃপুরে ঢুকে পার্ব্বতীর সঙ্গে দেখা করবার উপায় কি? অনেক ভেবে চিন্তে এক মৎলব ঠাওরালেন। মহাদেবের মনে হলো, পার্ব্বতী শাঁখা পরতে চেয়েছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ শাঁখারির বেশ ধারণ ক'রে গিরিরাজের বাড়ী উপস্থিত হলেন।

শাঁখারি এসেছে শুনে পার্ব্বতী বড় সুখী হ'লেন। রাণী মেনকা শাঁখারিকে বাড়ীর ভেতর আনালেন। পার্ব্বতী একটু ঘোমটা টেনে, কঙ্কণ খুলে শুধু-হাতের উপর খানিকটা আঁচল জড়িয়ে শাঁখা পরতে বসলেন। শাঁখারির আনন্দের সীমা নাই। শাঁখা পরানো আর ফুরোয় না। কতবার হাত টিপচেন, তেল মাখাচ্চেন, শাঁখা পরাচ্চেন, খুলচেন, মাজা ঘসা কচ্চেন। পার্ব্বতীকে দেখে মহাদেবের আশ মিটে না।

নূতন শাঁখা প'রে পার্ব্বতী মাতাকে প্রণাম কল্লেন। শাঁখারি মেনকা রাণীকে বল্লেন, আমি দাম চাইনে; বেলা হয়েছে, যদি অনুমতি হয় তবে এখানেই আজ স্নানাহার করবো। পার্ব্বতী শাঁখা পরবার সময়েই মহাদেবকে চিনেছেন। তিনি পরম যত্নে শাঁখারির স্নানের উয্যুগ ক'রে, নিজে রেঁধে নিজ হাতে পরিবেশন করলেন।

দেবতার চরিত্র মানুষের বুঝবার সাধ্য কি। সেই দিন রাত্রে মহাদেব নিজ মূর্ত্তিতে পার্ব্বতীর শয়ন ঘরে দেখা দিলেন। পার্ব্বতী বল্লেন, তোমার হাতের স্পর্শ পেয়েই আমি তোমাকে শাঁখা পরবার সময় চিনতে পেরেছি। তোমার তখন ছদ্মবেশে আসা ভাল হয়নি। মহাদেব বল্লেন, নিমন্ত্রণ না পেলে আমি এখানে আসি কি ক'রে? সেই রাত্রে দ্বাদশ দণ্ডের ভিতর পার্ব্বতীর এক কন্যা প্রসব হলো। পার্ব্বতী চিন্তিত হয়ে বল্লেন, তুমি এখানে এসেছ তা এখন মা-বাপের কাছে না ব'লে উপায় কি? জান তো এ স্বর্গ নয়; মর্ত্ত্যে আছি। মহাদেব বল্লেন, তোমার সে ভয় নাই, আমি এখনি মেয়েটীকে সঙ্গে ক'রে কৈলাসে যাচ্ছি। মহাদেব তাই কল্লেন। কিন্তু কতদূর রাস্তায়

গিয়ে মেয়েটী বল্লে, মা'কে না দেখে থাকতে পারবো কেন, আমি মর্ত্ত্যেই থাকবো। মহাদেব ছোট মেয়েটীকে আদর ক'রে "বুড়ী" ব'লে ডাকতেন। বুড়ীর কথায় তিনি বল্লেন, আচ্ছা তাই হোক। এই ব'লে এক বনে গিয়ে এক সেওড়াগাছ তলায় তাঁকে রেখে দিলেন; বল্লেন, বুড়ী তুমি এখানেই থাক। তুমি পৃথিবীতে বনদেবী ব'লে পুজো পাবে। তোমার ব্রত না করলে অন্য ব্রত করা নিষ্ফল হবে।

মহাদেব ভাবলেন, পার্ব্বতী কার্ত্তিক গণেশকে ফেলে আমি একা এখন কৈলাসে যাই কি ক'রে। কিছুদিন মর্ত্ত্যেই থাকবো। বুড়ী তো মর্ত্ত্যের বনদেবী হ'লেন। তাকেও মাঝে মাঝে দেখা উচিত। এই ভেবে তিনি নিকটেই ছদ্মবেশে এক মুদীর দোকান ক'রে রইলেন।

সেই পথে একদিন একটী দুঃখী মেয়ে বাজারে চুণ বিক্রী কত্তে যাচ্ছিল। তাঁর মাথায় এক চুণের মালশা। বনদেবী "বুড়া ঠাকুরাণী" তাকে ডাকলেন। সে চুণের মালশা নামিয়ে আশ্চর্য্য হয়ে দেখে, চুণতো নয়, সব দই! বনদেবী বল্লেন, আমার বড় খিদে পেয়েছে, তোমায় এই কড়িটী দিচ্ছি, তুমি দই রেখে মুদী দোকান থেকে চিড়ে, মুড়ি, চিনি, দুধ, মেঠাই এনে দাও। সে ভাবতে লাগলো একটা কড়িতে বেশী কি পাব। কিন্তু মুদীর দোকানে কড়িটি দিতেই "মুদী" কত জিনিষ দিলেন, তা ব'লে শেষ করা যায় না। মেয়ে-মানুষটি লোকজন নিয়ে একে একে সব জিনিষ বনদেবীর কাছে বয়ে নিয়ে এলো। বনদেবী সামান্য একটু খেয়ে সব জিনিষ মেয়ে মানুষটিকে দিলেন। আর তাকে এক 'আলসা' সোণা দিলেন। তখন

সেই বনে লোকে লোকারণ্য হলো। বনদেবী আদেশ দিলেন, আমি মহাদেবের কন্যা; অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষে শনিবারে আমার পূজা করিলে অপুত্রের পুত্র হয়, নির্ধনের ধন হয়, ছেলে মেয়ের ব্যারাম পীড়া হয় না, সকলে সুখে থাকে, আর হর-পার্ব্বতী তুষ্ট হন।

প্রণাম। বনদুর্গা বনস্থাচ বনমালা বিভূষিতা।
শঙ্করস্য প্রিয়পুত্রী বনদেবি নমোস্তুতে॥

ইতু-রা'ল ব্রত।

অগ্রহায়ণ মাসে "ক্ষেত্র" ও "বুড়াঠাকুরাণী" ব্রতের পরদিন (রবিবার) এই ব্রত করিতে হয়। এক বাড়ীতে দু'চার জন মহিলা একত্র হইয়া ইতু-রা'ল ব্রত করিবে; একা করিবে না। প্রত্যেক ব্রতচারিণী বিয়াল্লিশটা আতপ-তণ্ডুল নখ দ্বারা খুঁটিয়া লইবেন। পাঁচ মেয়ে একত্র হয়েছেন, এবং এতগুলি তণ্ডুল খুঁটিয়া লওয়া কিঞ্চিৎ সময় সাধ্য, ব্রতের উপাখ্যানও বড়; এজন্য তাঁহারা এই সময়েই নিম্নোক্ত ব্রত কথা শ্রবণ করেন। পূজান্তে ব্রত কথা স্মরণ করিয়া ভূতলে একটী আঁচড় কাটিলেই পুনরায় কথা শ্রবণ আবশ্যক হয় না।

মঙ্গলচণ্ডীর শেখর বা অর্ঘ্যের ন্যায় এ ব্রতেও অর্ঘ্য নির্ম্মাণ করিতে হয়। কিন্তু কলাপাতার পরিবর্ত্তে পিটুলির এক ঢেলা প্রস্তুত করিয়া তাহার ভিতর আতপ তণ্ডুল ও দুর্ব্বা স্থাপন করিবে। প্রতি ব্রতিনীর জন্য এইরূপ ছয়টী পিটুলি-পিণ্ডের অর্ঘ্য আবশ্যক।

প্রতি অর্ঘ্যে একুশগাছি দূর্ব্বা স্থাপন করিতে হয়। একটা অর্ঘ্যের নাম দুয়োরাজ, অন্যটা সুয়োরাজ। একটার ভিতর পূর্ব্বোক্ত বিয়াল্লিশটা আতপ-চা'লের অর্দ্ধেক (একুশ) দিতে হইবে, অপরটিতে একুশটি ধান দিবে। অবশিষ্ট একুশটি আতপ চা'ল আলাহিদা রাখিয়া দিবে। তার পর পূজা হইয়া গেলে পিটুলি দ্বারা একুশটী পু'লি (বা "দইলা") প্রস্তুত করিবে। উহার কুড়িটা ছোট এবং একটী বড় বর্ত্তুলাকার। এই বড়টীর ভিতর পূর্ব্বোক্ত অবশিষ্ট একুশটী আলো চা'ল দিবে। পূজান্তে রন্ধনের সময় এইগুলি ভাতের সঙ্গে সিদ্ধ করিবে। পুরোহিত পূর্ব্বাহ্ণে সূর্য্যের পূজা করিবেন। পূজান্তে ব্রতচারিণীগণ উল্লিখিত একুশটী পুলি ভক্ষণ ও ডাঁল সিদ্ধ ভাতেভাত আহার করিবেন। কথা শ্রবণের পর প্রণাম যথা;

জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরং॥

ইতু-রা'ল ব্রত কথা।

এক গরীব ব্রাহ্মণ। তাঁর গৃহ শূন্য। দু'টী পরমা সুন্দরী অবিবাহিতা ছোট কন্যা ছাড়া সংসারে তাঁর আর কেউ নাই। সারাদিন ভিক্ষা ক'রে যা পান তাতেই অতিকষ্টে দিন চলে।

একদিন মেয়েরা ভিক্ষার ধান কয়টী রোদে শুকুতে দিয়ে খেলা কচ্ছিল; কতগুলি পায়রা উড়ে এসে সব ধান খেয়ে ফেল্লে। মেয়ে দু'টি কাঁদতে লাগলো। তারা মনে কল্লে, বাবা সারাদিন পরে বাড়ী এলে, তাঁকে কি রেঁধে খাওয়াব, আর আমরাই বা কি খাব? রাগে ও দুঃখে তারা ক্ষেপে গিয়ে একটা

পায়রা ধরে ফেল্লে। এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বাড়ীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তাই দেখে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ে এসে বল্লেন, কর কি! কর কি! এ যে ইতু-রা'ল পরমেশ্বর ঠাকুরের পায়রা, এখুনি ছেড়ে দাও। তারপর মেয়েদের দুঃখের কথা শুনে বুড়ো ব্রাহ্মণের বড় দয়া হলো। তিনি বল্লেন, তোমরা ইতু-রা'ল ঠাকুরের ব্রত কর, তবেই তোমাদের সব দুঃখ দূর হবে। সেদিন অগ্রহায়ণ মাসের রবিবার; মেয়ে দু'টী তো উপোস করেই ছিল, তখনি তারা পূজো ক'রে ব্রত নিয়ম পালন কল্লে। ব্রতের পুণ্যিতে এক নিমেষে যেখানে তাদের কুঁড়েঘর ছিল সেখানে প্রকাণ্ড রাজ অট্টালিকা হলো। মরাই ভরা ধান হলো, গোয়াল ভরা গরু হলো, পাল ভরা মোষ হলো। বাড়ীঘর ধন জনে ভরে গেল।

মেয়েরা সেদিন আনন্দে পথের পানে চেয়ে আছে কখন বাপ বাড়ী আসবে। কিন্তু সন্ধ্যে হলো, তবু ব্রাহ্মণ ভিক্ষা ক'রে বাড়ী ফেরেন না; এজন্যে মেয়েরা বড় ব্যস্ত হলো। বড় মেয়েটীর নাম অমুনা, ছোটটী যমুনা। ছোট হলেও যমুনা অমুনার চেয়ে বেশী সেয়ানা। সে বল্লে, দিদি, বাবা আমাদের বাড়ীঘর এখন চিনতে পারবেন কেন? তিনি হয়তো ভাবচেন কোন রাজা এসে আমাদের তাড়িয়ে দিয়ে এখানে রাজ অট্টালিকা করেছে। চল যাই বাবাকে খুঁজে আনিগে। এই ব'লে তারা বাইরে গিয়ে দেখলে, ব্রাহ্মণের হাতে ভিক্ষার ঝুলি, তিনি বাড়ীর পাশে হা হুতাশ ক'রে পড়ে আছেন। মেয়েরা তাঁকে ইতু-রা'ল ব্রতের প্রত্যক্ষ ফলের কথা বলাতে তিনি আশ্চর্য্য হয়ে নূতন বাড়ীতে প্রবেশ কল্লেন। অমুনা ও যমুনা ইতু-রা'ল দেবতার .

কাছে প্রার্থনা কল্লে, ঠাকুর, আমাদের তো সবই হলো, কিন্তু ঘরে মা নেই ; আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করো।

সেই দেশের রাজার এক পরম রূপবতী কন্যা ছিল। রাজ-কন্যা বড় হয়েছেন তবু বিয়ে হয় নাই। আইবুড় সোমত্ত মেয়ে দেখে রাণীর মুখে ভাত রোচে না। রাজা অন্তঃপুরে আসতেন না, আর মেয়ে যে এত বড় হয়েছে তাও তাঁর জ্ঞান নাই। রাজা একদিন হঠাৎ অন্দরে এসে খেতে বসেছেন ; রাণী মেয়েকে দিয়ে পরিবেশন করালেন। রাজা কন্যাকে চিনতে পারেননি। রহস্য ক'রে বল্লেন, রাণি! তোমার ছোট বোনটীর চেহারা তো বেশ, তোমার চেয়ে সুন্দর ; এঁকে কবে আনলে? আহা, দুটা দিন এখানে থাক্। এবার আমাকে অন্তঃপুরে কয়েদ রাখবার বেশ উপায় ঠাউরিয়েছ। তোমার বুদ্ধি বলিহারি যাই, আর আমি অন্তঃপুর ছাড়বো না। রাণী খুব চটে বল্লেন, মরণ আর কি! চোকের মাথা খেয়েছ? আমিও তোমার বুদ্ধিকে বলিহারি যাই। রাজা নিজের ভ্রম বুঝতে পেরে লজ্জায় মরে গেলেন। তাঁর খাওয়া হলো না ; তিনি প্রতিজ্ঞা কল্লেন, কাল ভোরে উঠে যার মুখ দেখবো, জাত বিচার না ক'রে তাকেই কন্যা সম্প্রদান করবো। কন্যা সম্প্রদান না ক'রে আর এক বিন্দু জল গ্রহণ করবো না।

এদিকে সেই ব্রাহ্মণ এখন বড়লোক হলেও তাঁর বহুদিনের ভিক্ষাবৃত্তির অভ্যাসটি যায় নাই। ইতু-রা'ল ঠাকুর শেষ রাত্রে তাঁকে স্বপ্নে আদেশ দিলেন, তুমি খুব ভোরে উঠে রাজবাড়ী যাবে, রাজা দাতাকর্ণ হয়ে আজ দানের মতন মুদ্রা করবেন ; তুমি পশ্চিম মুখো হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে ; ভুলো না, সাবধান!

শেষ রাত্রের স্বপ্ন দেখে ব্রাহ্মণের আর ঘুম হলো না। ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে উঠে দুর্গানাম স্মরণ ক'রে ভিক্ষার ঝুলিটা হাতে লয়ে ব্রাহ্মণ তাড়াতাড়ি রাজবাড়ী ছুটে গেলেন এবং পশ্চিম মুখো হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। রাজা শয্যা ত্যাগ ক'রে সূর্য্য প্রণাম ক'রেই সর্ব্বাগ্রে ব্রাহ্মণকে দেখতে পেলেন। তিনি পরম তুষ্ট হয়ে তাঁকে শুভক্ষণে রাজকন্যা সম্প্রদান কল্লেন।

মা পেয়ে অমুনা ও যমুনার আনন্দের সীমা নাই। কিছু কাল পরে যখন তাদের একটী ভাই হলো তখন দু' বোন্ কিরূপ সুখী হলো তা বলবার নয়। ভাইটীকে কোলে ক'রে তারা সদাই বাড়ীর ভিতর হেসে খেলে বেড়ায়। কিন্তু নূতন ব্রাহ্মণীর চোখে মেয়ে দুটীর এতটা নির্ভাবনা ও স্ফূর্ত্তি ভাল লাগিল না। তিনি দেখলেন বাড়ীর লোকজন ওদের ইঙ্গিতেই যেন চলা ফেরা করে। ভাবলেন, এত বাড়াবাড়ি কেন? ওদের যদি তাড়িয়ে না দিতে পারি তবে আমি রাজার মেয়েই নই।

একদিন দুই বোন্ ইতু-রা'ল ব্রতের উদ্যোগ ক'রে মাকে বল্লে, মা ভাইটীকে কোলে নাও, আমাদের ব্রতের জিনিষ ফেলে দিচ্ছে। যেই এই বলা, আর অমনি ব্রাহ্মণী হঠাৎ রেগে ছেলের গায় ঠাস্ করে এক চড় দিয়ে বল্লে, 'হতভাগা ছেলে! কেন ওদের কাছে যাস্। ছেলেটা ট্যাঁ ট্যাঁ ক'রে কাঁদতে লাগলো। ব্রাহ্মণী রাগে গর্ গর্ ক'রে ছেলেটাকে কোলে তুলে নিয়ে পাড়া-প্রতিবেশীদের বাড়ী গিয়ে শুয়ে রইলেন। বামুন ঠাকুর তখন বাড়ী ছিলেন না। বাড়ী এসে তিনি ব্রাহ্মণীকে দেখে আনতে গেলেন। অনেক সাধ্যি সাধনার পর ব্রাহ্মণী বল্লে, আমি তেমন মানুষের মেয়ে নই, অপমান হতে তোমার ঘর•

কত্তে আসিনি। এই অবোধ শিশু "দিদি দিদি" ব'লে অধীর হয়। তোমার দস্যি মেয়ে দুটার কোন কাজ কর্ম্ম নেই, ফি রবিবার পিটুলির পুতুল গড়ে খেলা-করে, শিশুকে কিছুতেই খেলাতে দেবে না, তাকে মেরেচে। আর আমায় যা-না-বলবার তাই ব'লে গালাগাল দিয়েচে; ঘেন্নায় লজ্জায় আমি পালিয়ে এসেচি। তুমি কন্যা নিয়ে সুখে ঘরকন্না কর, আমাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও; সেখানে আমার চা'ট্টি অন্নের অভাব হবে না। হায়, আমি কেন এমন ছোট লোকের ঘর কত্তে এলুম। এই ব'লে ব্রাহ্মণী মুখে আঁচল দিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

বেচারী বামুনের মুখে কথা নাই। তিনি ভাবলেন ব্যাপার গুরুতর; অমুনা ও যমুনা নিশ্চয়ই বিশেষ অপরাধ করেছে। ব্রাহ্মণকে নরম দেখে ব্রাহ্মণী আবার কান্নার সুরে বল্লেন, যদি মেয়ে দুটোকে কালই বনবাস দাও তবেই আমি তোমার ঘরে যাব নইলে আমি এখুনি বিষ খেয়ে মরবো। ব্রাহ্মণ বল্লেন, বনবাস তো বনবাস, যদি তুমি বল আমি ওদের এখুনি কেটে ফেলি। তুমি মনে ক'রে নাও আমি ওদের বনবাস দিয়েছি, তুমি ঘরে চল। এই ব'লে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর হাত ধরে বাড়ী ফিরলেন।

পরদিন ব্রাহ্মণ কন্যাগণকে ডেকে বল্লেন, চল, আমার সঙ্গে তোমরা তোমাদের মাসীর বাড়ী যাবে। তারা আশ্চর্য্য হয়ে বল্লে, বাবা, বল কি, আমাদের তো মাসী নেই! "হ্যাঁ আছে বৈ কি, তোমরা ছেলে মানুষ, সব জান না" এই ব'লে সারাদিন পথ হেঁটে, বামুন ঠাকুর মেয়েদের সঙ্গে ক'রে সন্ধ্যের কিছু আগে এক ঘোর অরণ্যে প্রবেশ করলেন। ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হয়ে

মেয়েরা বাপের কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লো। বামুনের দুর্ম্মতি হয়েছে; তিনি কন্যাদের শিয়রে দুখানি ইট রেখে আস্তে আস্তে সরে পড়লেন।

দুপুর রাত। মেয়ে দু'টীর ঘুম ভাঙ্গলো। তারা দেখলে বাপ নেই, চাদ্দিকে ঘোর আঁধার ও বাঘ ভালুকের রব। এখন উপায়! যমুনা সেয়ানা; সে বল্লে, দিদি বুঝতে পাচ্ছ না! বাবা আমাদের মায়ের চক্রান্তে বনবাস দিয়েছেন। তখন দু'বোন করযোড়ে ইতু-রা'ল ঠাকুরকে ভক্তিভরে ডাকতে লাগলো। তাঁর কৃপায় কোন ভয় রইল না; দুই ভগিনী বনের ভিতর এক কুটীরে বাস কত্তে লাগলো। ইতু-রা'ল ঠাকুর তাদের সঙ্গে রইলেন।

একদিন এক দূর দেশের রাজপুত্র আর মন্ত্রীর পুত্র বনে মৃগয়া কত্তে এসেছেন। তাঁরা পিপাসায় কাতর হয়ে জলের অন্বেষণে অরণ্যের ভিতর লোকজন পাঠালেন। তারা কুটীরে এসে ব্রাহ্মণ কন্যাদের কাছ থেকে জল নিয়ে গেল। ইতু-রা'ল ঠাকুরের চক্র, তাই জলপানের সময় রাজ-পুত্র ও মন্ত্রী-পুত্র জলের ভিতর খুব লম্বা দু'গাছি মাথার চুল দেখতে পেলেন। তাঁরা আশ্চর্য্য হয়ে বল্লেন, আহা চুল তো নয়, যেন শ্যামাঠাকুরুণের কেশ! এই ঘোর অরণ্যে সুকেশী রূপবতী রমণী কোথায়? অনুসন্ধান ক'রে জানতে পারলেন কুটীরের ভিতর দুইটী পরমা সুন্দরী কন্যা আছে। তাঁরা কুটীরে গিয়ে তাঁদের দেখে মোহিত হয়ে গেলেন। ইতু-রা'ল ঠাকুর তাঁদের মন জেনে ছদ্মবেশে [illegible] হয়ে, রাজপুত্রের সঙ্গে অমুনার এবং মন্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে যমুনার বিয়ে দিলেন। তাঁরা বউ নিয়ে খুব ঘটা ক'রে বাড়ী

যাত্রা করলেন। তখন যমুনা অমুনাকে বল্লেন, দিদি তুমি চল্লে তোমার বাড়ী, আমি চল্লুম আমার বাড়ী; কিন্তু সাবধান ইতু-রা'ল ঠাকুরের ব্রত যেন ভুলো না।

কিছু দিন পর রাজপুত্র রাজা হলেন, মন্ত্রীর পুত্র মন্ত্রী হলেন। তাঁদের দু'জনেরই ছেলে হলো। পরম সুখে দিন যেতে লাগলো। রাণীর উপর রাজার অগাধ ভালবাসা। তিনি যা বলেন রাজা তাই করেন। রোজ নূতন হীরের ফুল, গজ-মুক্তোর হার রাণীকে পরিয়ে রাজার আশ মিটতো না। একদিন রাজার চোকে রাণীর পায়ের আলতার রং একটু যেন ময়লা বোধ হলো। আর অমনি, রাণীর ঘর ভাল ক'রে ঝাঁট দেয়নি কেন এই অপরাধে, ঝাড়ুদার ও তার সাত ছেলের গর্দানা নেবার হুকুম দিয়ে ফেল্লেন।

কিন্তু রাজার এত যে ভালবাসা, তা একদিন বালির বাঁধের মত ধসে গেল। রাণী অমুনা পিটুলির পুলি গড়ে ইতু-রা'ল ব্রত কোরতেন। রাজা প্রায়ই বোলতেন, ছি, তুমি হলে রাজরাণী, ফুলের তোড়া হাতে নিয়ে পরীটির মত সারাদিন বসে থাকবে। আর যদি ব্রত করতেই হয় তবে রাজা রাজড়ার মত ব্রত করবে; হাতী দান করবে, ঘোড়া দান করবে। তা না ক'রে, এ তুচ্ছ পিটুলির ব্রত তোমায় কে শেখালে? আমার কথাটা রাখ, এ ব্রত আর করো না। রাণী আর কিছুতেই মানা শুনলেন না। একদিন রাজা ব্রতের জিনিষ পায় ঠেলে ফেলে দিয়ে রেগে আগুন হয়ে বল্লেন, জঙ্গলী মেয়ে! জঙ্গলই তোর যোগ্য স্থান। এই ব'লে অমুনাকে বাড়ী হ'তে তাড়িয়ে দিলেন। ইতু-রা'ল ঠাকুর বিরূপ হলেন।

অমুনার দুঃখের সীমা নাই। কাল রাজরাণী ছিলেন, আজ পথের ভিকিরি। তিনি ভাবলেন, এখন যাই কোথা। বাপের বাড়ী ঠাঁই নাই। এমন যে রাজরাজেশ্বর সোয়ামী, তিনিও আমায় ত্যাগ করলেন! হায়, এ দুঃখের কথা কার কাছে বলি। যমুনা এক মায়ের পেটের বোন্, অনেক দিন তার সঙ্গে দেখা নাই। তাকে একবার না দেখে কোথাও যাব না। এই ভেবে তিনি তাঁর ছেলেটীকে কোলে ক'রে কাঙালীর বেশে মন্ত্রীর বাড়ীর দিকে চল্লেন। অন্দরের দরজায় গিয়ে তাঁর বুক দুর দুর করতে লাগলো। খিড়কির পুকুর পাড়ে বসে ভাবতে লাগলেন, ভগিনী কি আমায় এ বেশে চিনতে পারবে। তখন দেখলেন যমুনার দাসী তাঁর স্নানের জল নিয়ে যাচ্ছে। তিনি নিজের হাতের আংটি লুকিয়ে কলসীর ভিতর ফেলে দিলেন।

যমুনা ঘরে বসে স্নান কোরছিলেন। জল ঢালতেই অমুনার আংটি তাঁর গায়ে পড়লো। তিনি দাসীকে বোকে উঠলেন, ঝি, বল্ দেখি তোর কি আক্কেল, তুই "তুক" করেছিস্ না কি? স্নানের জলের ভেতর আংটি দিলি কেন? দাসী ভয়ে জড়সড় হয়ে বল্লে, ঠাকরুণ আমি তো কিছুই জানি না। তবে পুকুর পাড়ে একটী মেয়ে ও একটী ছোট ছেলে বসে রয়েছে এই জানি। মেয়েটী দেখতে তোমারই মতন সুন্দর, গরীব অথচ দামী গহনা পরা; আমার সন্দেহ হয় এ তারই কাজ। যমুনা আংটী তুলে দেখলেন ও দিদিকে চিনতে পারলেন। অমনি ছুটে গিয়ে তাঁকে ও তাঁর ছেলেকে পরম সমাদরে ঘরে নিয়ে এলেন।

অনেক দিন পরে দুই ভগিনীর পরস্পর দেখা। চোকের জল মুছিতে মুছিতে কত সুখ দুঃখের কথা তাঁরা বলিতে লাগি-

লেন। যমুনা রাজার দুর্ম্মতির কথা শুনে কাঁদতে লাগলেন। অমুনাকে তিনি গোপনে নিজ বাড়ীতে রাখলেন। অমুনা যমুনাকে বল্লেন, বোন্ আমি যে এখানে রইলুম তা কেউ রাজার কাণে না তোলে; মন্ত্রী মশাইকে ব'লে কাজ নেই। যমুনা বল্লেন, দিদি মন্ত্রীর মন্ত্র আমার হাতে, তোমার কোন ভয় নাই। তুমি নিশ্চিন্ত থাক।

এদিকে, কিছুদিন পর রাজার চৈতন্য হলো। তিনি রাণীর জন্য ব্যাকুল হলেন। অনুতাপ ক'রে মন্ত্রীকে বল্লেন, আমি বিনা দোষে রাণীকে ও ছেলেকে তাড়িয়ে দিয়েছি; যত টাকা লাগে দেবো, তুমি লোকজন পাঠিয়ে তাঁদের খুঁজে নিয়ে এসো। রাণীকে না দেখে আমার প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে।

মন্ত্রী মহা বিপদে পড়লেন। সব লোক ফিরে এলো, কেউ রাণীর খোঁজ পেলে না। রাণীকে পাওয়া গেল না বল্লে চাকরি তো থাকবেই না, আরও কি হয়, এই ভেবে তিনি মনের দুঃখে লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে রইলেন। যমুনা এসে বল্লেন, তুমি এত ভাবচো কেন, আমি থাকতে তোমার চাকরি যাবার ভয় নাই। রাজা রাণীর জন্যে এত উতলা হয়েছেন তা শুনে আমি সুখী হলেম। রাণীর সঙ্গে যাই হোক আমার একটা রক্তের টান আছে, এজন্যে আমি নিজেই লোক পাঠিয়ে তাঁকে খুঁজে নিয়ে এসেছি। তুমি যাও রাজাকে সংবাদ দাওগে, আমি রাণীকে পাল্‌কী ক'রে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

যমুনা রাণীকে ও তাঁর ছেলেকে সাজগোজ করিয়ে অনেক ধন রত্ন সঙ্গে দিয়ে রাজবাড়ীতে পাঠিয়ে দিলেন। ঐসব ধন রত্ন রাজভাণ্ডারে না যাইতেই ইতু-রা'ল ঠাকুরের কোপে অদৃশ্য

হইয়া গেল। রাজা রাণীকে পেয়ে প্রথমে খুব সন্তুষ্ট হলেন বটে, কিন্তু তাঁকে কিছুতেই ব্রত করতে দিলেন না। অনেক দিন ব্রত না করাতে রাণীও ব্রত ভুলিয়া গেলেন। সে দিন থেকে মা লক্ষ্মীও রাজবাড়ী ত্যাগ করলেন। রাজার হাতীশালে হাতী মলো, ঘোড়াশালে ঘোড়া মলো; দারুণ রোদে শস্য পুড়ে গিয়ে দেশে দুর্ভিক্ষ হলো। রাজা ভাবলেন কি কুক্ষণে আমি এই বনবাসিনীকে ঘরে এনেছিলেম। আমার সোণার সংসার ছিল, সবই ছারখার হয়ে গেল। একবার তাড়িয়ে দিয়েছিলেম, ভালই হয়েছিল। আবার অলক্ষ্মীকে ডেকে নিয়ে এসে কি আহাম্মুকি করেছি! রাণী ও তার পেটের ছেলেটা বেঁচে থাকতে আমার কিছুতেই ভাল হবে না।

রাজা মন্ত্রীকে ডাকিয়ে বল্লেন, দেখ ভাই তুমিও বনবাসিনী কন্থে বিয়ে করেছ আমিও তাই করেছি। তবে তোমার এত সুখ সম্পদ কেন, আমারই বা সব উল্টো কেন? রাণী বেঁচে থাকতে আমার অদৃষ্টে কিছুতেই শান্তি নাই। রাণীর ও তার ছেলের সুন্দর মুখ ও রূপ দেখলে আমি সব ভুলে যাই। আমি নিজ হাতে হত্যা করতে পারবো না; জল্লাদের হাতে দিয়ে অপমান করবারও ইচ্ছে নাই। আমি আদেশ দিচ্ছি, তুমি এক কাজ কর। রাণীকে ও তার ছেলেকে গোপনে নিয়ে যাও, গোপনে হত্যাসাধন ক'রে আমাকে তাদের রক্ত দর্শন করাও। তাদের রক্ত দেখলেই আমার শান্তিলাভ হবে। যাও, আর দ্বিরুক্তি করিও না।

মন্ত্রী বাড়ী গিয়ে যমুনাকে বল্লেন, এখন উপায়? যমুনা খানিক চুপ ক'রে ভাবতে লাগলেন। পরে বল্লেন, রাজার

হুকুম, তা অমান্য করা তোমার উচিত হয় না। রাজার আদেশ ভাল কি মন্দ সে বিচার উপরওয়ালা ভগবান করবেন, সে ভার আমাদের নয়। তুমি হুকুম মত ওদের রাজবাড়ী থেকে গোপনে নিয়ে এসো। মন্ত্রী তাই করলেন। যমুনা ভাবলেন, রাজা-রাজড়ার মেজাজ, একবার বোল্‌চে তাড়িয়ে দাও, আবার বোল্‌চে এনে দাও। আজ বোল্‌চে কেটে ফেল, আবার কাল কোন্ না বল্‌বে বাঁচিয়ে এনে দাও। রাজার দুর্ম্মতি হয়েছে, দিদিও ব্রত ভুলে গেছে। যাই হোক, আমি এর প্রতীকার কচ্ছি। তার পর তিনি কতগুলি মশলা লালরঙ্গে গুলে মন্ত্রীর কাছে গিয়ে বল্লেন, আমি কাজটা সেরে ফেলেছি। রাজার আদেশ, কি করা যায়। ছেলে বেলা কার বোন্ বই তো নয়, তা এমন বেশী কি। বিয়ে হয়ে গেলে পর আর সম্পর্ক কি। আমরা ভাল মন্দ বুঝি না, আমাদের অন্ন বজায় থাকলেই হলো, কি বল? আমি লোক দিয়ে খুব গোপনে ওদের কেটে ফেলে এই রক্ত এনেছি; যাও রাজাকে দেখাওগে। রক্ত না দেখলে তাঁর প্রত্যয় হবে না। মন্ত্রী তাই করলেন! যমুনা, রাণী ও তাঁর ছেলেকে লুকিয়ে ঘরে রাখলেন।

একদিন যমুনা বোলচেন, দিদি ব্রতটা ভুলে গিয়েই তোমার এই দশা। আমার কথা রাখ, তোমার ব্রত করতেই হবে। তা শুনে অমুনা বোলচেন, বোন, কি সুখ কামনা ক'রে আমি ব্রত করবো? সোয়ামীর চেয়ে বড় দেবতা মেয়ে মানুষের আর পৃথিবীতে নাই। সেই সোয়ামী যদি ব্রত না করলেই সুখী হন, তবে তাঁর মনে কষ্ট দিয়ে আমার লাভ কি। তাঁর অনুমতি না পেলে আমি কি ক'রে ব্রত করবো। আর আমি

এখনও বেঁচে আছি তা শুনেই বা তিনি কি মনে করবেন? কেবল এই শিশুটীর মুখ দেখে আমার এখনো মরতে ইচ্ছা হচ্চে না। এই ব'লে রাণী অমুনা চো'কে আঁচল দিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

এইরূপে কিছুদিন চলে গেল। পাছে ব্রত করতে হয় এই ভয়ে অমুনা উপোস থাকতেন না। রোজ সকালে উঠে কিছু না খেয়ে বোনের সঙ্গে দেখা করতেন না।

যমুনা ভাবলেন, দিদি যাই বলুন, ইতু-রা'ল ঠাকুরের কৃপা না হ'লে তাঁর উদ্ধার নাই। আস্‌ছে কাল রবিবার; এঁকে জোর করে উপোস রেখে সকাল সকাল ব্রত করাতে হবে। মনে একটা মৎলব এঁটে তিনি সে দিন রাত্তিরে মন্ত্রীর বিছানা বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে ভগিনীর সঙ্গে এক শয্যায় শয়ন করলেন। অমুনা ঘুমিয়ে পড়লে তাঁর আঁচলে নিজের আঁচল বেঁধে, হাতে হাত বেঁধে শুয়ে রইলেন, যেন রাণী সকালে উঠে কিছু মুখে দিতে না পারেন।

এদিকে মন্ত্রী মহাশয়ের চো'কে ঘুম নাই। তিনি মনে করলেন, গিন্নির বুদ্ধি বেশী বয়সও কাঁচা, ভাবনার কথা বটে। আমার চো'কে কি ধুলো দিচ্ছে, ভগবান জানেন। কিছু না বোলে কোয়ে আজ হঠাৎ আমাকে বাইরে রাখলে কেন? রাজা কি দোষে ছেলে-শুদ্ধ সুন্দরী স্ত্রীকে ত্যাগ করলেন তা ঠিক জানি না, এ তো তারি সহোদরা! সারা রাত মন্ত্রীর ঘুম হলো না, মনে দারুণ সন্দেহ জন্মালো। খুব ভোরে উঠে তিনি অন্দরে গিন্নির-ঘরে ঢুকে যা দেখলেন তাতে তার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে! ... হাতে নাতে ধরে ফেলেছি! কোন্ পর-

পুরুষের সঙ্গে একত্র আলিঙ্গনবদ্ধ হয়ে শুয়ে রয়েছে! তবে রে বিচারিণি, জঙ্গলী মেয়ে! রাজা রাণীর কেবল রক্ত দেখেছেন, আমি তোর রক্তে স্নান করবো। এই ব'লে রাগে অন্ধ হ'য়ে যেই একখানি দা হাতে তুলে নিয়েছেন অমনি দেখতে পেলেন, যাকে পুরুষ ভেবেছেন তাঁর পায়ে মল ও হাতে শাঁখা।

মন্ত্রীর যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো। তিনি যমুনাকে জাগিয়ে সব কথা শুনলেন। তিনি ভাবলেন, স্ত্রী আমার পরম সতী; এঁরি পুণ্যবলে আজ দু দু'টী স্ত্রীবধ হতে রক্ষা পেলুম। রাণীকে বিনা বিচারে হত্যা করিয়েছি মনে ক'রে আমার ঘুম হতো না; এঁরি পুণ্যবলে সে পাপ আমার হয়নি। ইতু-রা'ল ঠাকুরকে ধন্যবাদ! এই ব'লে তিনি নিজে উয্যুগী হয়ে রাণীকে ও স্ত্রীকে খুব সমারোহে ব্রত করালেন। রাণীর কোন দোষ নাই, রাজারই দুর্ম্মতি হয়েছে তা তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারলেন। তিনি সকলকে বলতে লাগলেন, আমি আর রাজার ভয় করি না, তিনি পাগল হয়েছেন।

রাণী ব্রত সমাপন ক'রে করযোড়ে বর মাগলেন, ভগবান ইতু-রা'ল ঠাকুর! স্বামী আমার দেবতা, তাঁকে সুমতি দাও, আমার আর কিছু আকাঙ্ক্ষা নাই। তাঁর দোষ ক্ষমা কর।

রাজার মতির স্থিরতা নাই। রাণীর অভাবে তিনি আবার অধীর হয়ে উঠলেন। তিনি মন্ত্রীকে এখন রোজ বোলচেন, হায় আমি কি কাজ করেছি। রাণী আমার গৃহের লক্ষ্মী ছিলেন; তিনি যাবার পর আর ঘরের শ্রী ফিরিল না। রাণী তাঁর ইষ্ট দেবতার ব্রত কোরতেন, আমি না বুঝে তাঁর অপমান করেছি। এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। ভাই, বলে দাও কোন্ স্থানে

আমার দেবীর দেহের রক্তপাত হলো ; সেই খানে আমার নিজ শরীরের রক্তপাত ক'রে পৃথিবী হইতে বিদায় নিই। রাজার সময়ে নাওয়া নাই, সময়ে খাওয়া নাই, মুখে কেবল "রাণী যমুনা"।

রাজা রাণীর শোকে ক্রমে পাগল হয়ে উঠলেন। এখন তাঁর জ্ঞান নাই। একদিন মন্ত্রীকে বল্লেন, মন্ত্রী, যত টাকা লাগে দেবো ; স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল যেখান থেকে পার আমার রাণীকে খুঁজে এনে দাও। নইলে ঠিক জেনো, তোমার গর্দ্দানা নেবো। যাও, দু'দিন সময় দিলুম।

বাড়ী এসে মন্ত্রী বল্লেন, গিন্নি তুমিই আমার ধড়ে মুণ্ড রাখলে। চাকরি তো দূরের কথা, এবার প্রাণ নিয়ে টানাটানি হয়েছিল। দাও, রাণীকে শীঘ্র আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দাও। এই ব'লে তিনি রাজার নূতন হুকুমের কথা সব খুলে বল্লেন। তা শুনে যমুনা বল্লেন, আমি সব আগেই জানি। তোমার অত তাড়াতাড়ি কেন, অন্ততঃ দুটা দিন যাক। তারপর স্বামীর সাহস পরীক্ষা করবার জন্যে তিনি বল্লেন, কা'ল তুমি রাজ দরবারে গিয়ে রাজাকে দেখে প্রণাম করো না। মন্ত্রী বল্লেন, সে কি কথা! আমার ঘাড়ে একটা বই দশটা মাথা নয়। তিনি হচ্ছেন রাজা, তাঁকে দেখে প্রণাম না জানালে কি আর রক্ষে আছে? যমুনা হেঁসে বল্লেন, তুমিই তো সে দিন গরব ক'রে বোলছিলে "আমি রাজাকে ভয় করি না, তিনি পাগল হয়েছেন"। মন্ত্রী লজ্জিত হ'লেন। যমুনা তখন তাঁকে সাহস দিয়ে কি কি করতে হবে সে বিষয়ে অনেক উপদেশ দিলেন।

পরদিন রাজার সঙ্গে তার দেখা হলো। চক্ষু লজ্জার ভয়ে মন্ত্রী একটু মুখ ফিরিয়ে প্রণাম করলেন। রাজা কুপিত হলেন।

রেগে কথা কইতে পারেন না। তখন মন্ত্রী বল্লেন, রাজা তুমি নিশ্চয়ই পাগল হয়েছ; নইলে যে রাণীকে স্বয়ং হুকুম দিয়ে কেটে ফেলেছ তাকে খুঁজে দেবার জন্য হুকুম দেবে কেন? আমার গর্দ্দানাটা তো গিয়েই রয়েচে তবে আর তোমাকে প্রণাম বা কেন, ভক্তিই বা কেন? তোমাকে আর আমি ভয় করি না। শুনে রাজা নরম হয়ে গেলেন। মন্ত্রী আবার বলতে লাগলেন, রাজা, তোমার প্রতি ইতু-রা'ল ঠাকুরের কোপ। তাঁর ক্রোধের শান্তি না হ'লে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল খুঁজলেও রাণীকে আর পাওয়া যাবে না। যদি ভাল চাও, তবে আমার ঘরে চল। আমার স্ত্রী আজ ইতু-রা'ল ঠাকুরের ব্রত করবে; ঠাকুরের কৃপা হলে রাণীকে ও ছেলেকে পেলেও পেতে পার।

রাজা তাই করলেন। তিনি মন্ত্রীর বাড়ী গেলেন। অমুনা ও যমুনা ভক্তি ক'রে ব্রত সমাপন করলেন। তারপর যমুনা, অমুনাকে ও তাঁর ছেলেকে সাজিয়ে গুজিয়ে আড়ালে রাখলেন। তখন মন্ত্রী রাজাকে অন্দরে ডেকে এনে বল্লেন, ব্রত হয়ে গেছে তুমি ভুঁয়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম কর। রাজা সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। চোখ বুজে মনে মনে প্রার্থনা করলেন, ঠাকুর আমার শত অপরাধ মার্জ্জনা কর। রাণীকে ও পুত্রকে বিনাদোষে প্রাণদণ্ড করেছি, তোমার চরণে এই ভিক্ষা তাঁদের সঙ্গে আমায় মিলিত কর। পৃথিবীতে আমার অন্য সাধ নাই। এই বলিয়া রাজা মাটীতে মাথা লুটাইয়া গাত্রোত্থান করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে চোখ মেলিয়া দেখতে পেলেন, রাণী ও তাঁর পুত্র ঠিক সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। রাজা আনন্দে আত্মহারা হয়ে তাঁদের জড়িয়ে ধরলেন।

রাজা রাণীর আনন্দের সীমা নাই। এত আহ্লাদের ভিতরেও তাঁদের দু'জনের চো'কে জল। রাজা স্ত্রীপুত্রকে সঙ্গে নিয়ে মহা সমারোহে রাজবাড়ী চল্লেন। রাজ বাড়ীতে মহা ধুমধাম। সাত দিন সাত রাত চারদিকে কেবল "খাও দাও" রব। রবি-বার দিন আমোদ আহ্লাদে রাজা ও রাণী আহার ক'রে উঠেছেন, এমন সময় ইতু-রা'ল ব্রতের কথা মনে পড়ে গেল! এখন উপায়? এই আনন্দের কোলাহলের ভিতর রাজ বাড়ীতে আর কে উপবাসী আছে, যে তাঁদের হয়ে আজ ব্রত করবে! তখন খোঁজ খবর ক'রে জানা গেল, সেই ঝাড়ুদারের বিধবা স্ত্রী, পতি-পুত্রশোকে জর্জ্জরিত হ'য়ে এ পর্য্যন্ত জল গ্রহণ করে নাই। রাজা রাগের মাথায় বিনা দোষে, বিনা বিচারে তার স্বামীর ও সাত পুত্রের প্রাণ দণ্ড করেছিলেন। রাজার মনে বড় অনু-তাপ হলো। এই বিধবা পুত্র-শোক-কাতরা দুঃখী রমণীর চো'কের জল থাকতে কিছুতেই আমার মঙ্গল হবে না। রাজা তাকে সমাদরে ডেকে প্রতিনিধি ক'রে ইতু-রা'ল ব্রত করালেন। তখনি তার সোয়ামী ও সাত ছেলে বেঁচে উঠলো। রাজা প্রজা সকলেরই আনন্দের সীমা রহিল না। "জয়, ইতু-রা'ল ঠাকুরের জয়" রবে চারি দিক ছেয়ে গেল।

রাণী অমুনা ও মন্ত্রী-মহিষী যমুনা মাবাপকে দেখবার জন্য ব্যাকুল হলেন। তাঁদের পূর্ব্ব আচরণ মেয়েরা এখন ভুলে গেছেন। এক রাজার জামাই ও আর এক রাজার শ্বশুর, সেই ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ পেয়ে ব্রাহ্মণী ও পুত্রকে সঙ্গে ক'রে অনেক দিন পর মেয়েদের দেখতে এলেন। যমুনা বয়ঃপ্রাপ্ত ভাইকে কোলে নেবার উদ্যোগ অভিনয় ক'রে মা'কে হেঁসে বল্লেন, মা' দুই

ভাইটি আমাদের ব্রতের জিনিষ তো ফেলে দেবে না? মাও হেঁসে উত্তর করলেন, সে ভয় এখন তোমাদের নাই; আমিও ইতু-রা'ল ঠাকুরের ব্রতটী শিখেছি। তোমরা আমার পেটের সন্তান। দুয়োরাজ ও সুয়োরাজকে সঙ্গে ক'রে ইতু-রা'ল ঠাকুর আমাকে স্বপ্নে আদেশ দিয়েছেন, সোয়ামীর ছেলেতে ও নিজের পেটের ছেলেতে যে তফাৎ মনে করে সে অভাগী যেন আমার ব্রত না করে।

ধ্যান। ওঁ ক্ষত্রিয়ং কাশ্যপং রক্তং কলিঙ্গং দ্বাদশাঙ্গুলং।
পদ্মহস্তদ্বয়ং পূর্ব্বাননং সপ্তাশ্ববাহনং।
শিবাধিদৈবতং সূর্য্যং বহ্নি প্রত্যধি দৈবতং॥

৬৬ পৃষ্ঠায় প্রণাম মন্ত্র দেওয়া হইয়াছে। কেবল বিল্বপত্র দ্বারা ইতু-রা'ল দেবের পূজা করা নিষেধ।

কুলই ব্রত।

এই ব্রত অগ্রহায়ণ মাসে রবিবার কিম্বা বৃহস্পতিবারে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। পুরোহিত কুল-দেবতার অর্চ্চনা করেন। এক খানি কুলার উপর ছাতু (শক্তু) দ্বারা কুলদেবতার মূর্ত্তি রচনা করা হয়। মঙ্গল ও শুক্রবারের অপর নাম কুলবার। কুলবারে কুলচণ্ডী বা কুলই চণ্ডী পূজার প্রথা অন্যত্র থাকিলেও, তৎসঙ্গে এতদ্দেশীয় কুলই-ব্রতের কোন সংস্রব নাই।

কুলকামিনীগণ এই ব্রতের দিবস অন্নাহার না করিয়া খই, চিড়া, দই, ছাতু ইত্যাদি ভোজন করিয়া থাকেন।

ধ্যান। ওঁ কুলদেবং মহাভাগং শত্রুঘ্নঞ্চ বরপ্রদং।
শার্দ্দূল বাহনং দেবং নানালঙ্কার ভূষিতং।

কুলই ব্রত কথা।

এক বিধবা ব্রাহ্মণী। তিনি বড়ই "শুদ্ধাচারিণী"। নিষ্ঠা ও শুদ্ধাচারের বাড়াবাড়িতে তিনি শুচিবাইগ্রস্তা হয়ে পড়লেন। ময়লা কাপড় পরতেন, আর যেমন তেমন পুকুর বা ডোবার ময়লা জলে একটা ডুব দিলেই শুদ্ধ হলেন মনে করতেন। বাড়ীর ছোট ছোট শিশুরা খেলতে খেলতে কাছে এলে তাদের ছোঁবার ভয়ে চমকে উঠে দশ হাত দূরে সরে যেতেন। কোথাও কিছু নাই, তবু তিনি ভাবতেন সব 'সগড়ী' হয়ে গেল! এজন্য দিনে সাতবার স্নান করতেন। কোন জিনিষ একবার ধুয়ে শুদ্ধ মনে হতো না। রোজ ঝাঁট দিবার আগে কাঠিগুলি খুলে, গোবর মেখে, ধুয়ে, আবার বেঁধে তবে ঝাঁট দিতেন।

তিনি আর কা'কেও গৃহ দেবতার সেবা করতে দিতেন না; অথচ, তিনি নিজে মুখে আঁচল বেঁধে, নৈবেদ্য রচনা ও পূজার আয়োজন করতে গেলে, যে পূজা সকালে হবার কথা, তা সন্ধ্যার আগে কিছুতেই হতো না। আর এক কথা। তিনি রাঁধবার আগে কাঠগুলি জলে ধুয়ে নিতেন। ভিজে কাঠ, এজন্যে কিছুতেই সন্ধ্যার আগে দেবতার ভোগ হতো না। পচা গোবরের দুর্গন্ধে ঠাকুরের ঘরে তিষ্ঠানো ভার। দেবতারা আর কত সহ্য করিবেন। তাঁরা এই সব কারণে বড় কুপিত হলেন;

ব্রাহ্মণীর পূজা গ্রহণ করলেন না। একদিন তিনি পূজার ঘরে প্রবেশ করবেন এমন সময়ে দৈববাণী হলো, সাবধান! তুমি এঘরে আর কখনো এসো না।

দেবতার কোপ হ'লে কিছুই অসম্ভব নয়। গ্রামে দৈববাণীর নানাজনে নানারূপ ব্যাখ্যা করতে লাগলো। বিধবা কুলকামিনীর কুৎসা রটনা হলো। ব্রাহ্মণী তাহা শুনিয়া যেন মরিয়া গেলেন। তাঁর আহার নিদ্রা নাই। রিষ্টি খণ্ডনের দুরাশায় রাহু কেতু শনি ও পীরের পূজা মানত করলেন, নানাস্থান হতে তাবিজ ও মাদুলি সংগ্রহ ক'রে হাতের কনুইতে, গলায় ও মাথার চুলে ধারণ করলেন। কিন্তু দেবতার কোপ; কিছুতেই দুর্ণাম দূর হলো না।

অনেক লাঞ্ছনার পর দেবতারা অবশেষে তাঁকে স্বপ্নে আদেশ দিলেন, তুমি শুচিবাই ত্যাগ কর, সর্ব্বদা মন খাঁটি রেখে ভক্তিভাবে কুলদেবতার পূজা কর। তবেই তোমার দুর্ণাম দূর হয়ে সুনাম হবে, আর চিরকাল সুখে থাকবে।

তিনি তাই করলেন। দেবতার কোপ গেল। সেই অবধি পৃথিবীতে কুলই ব্রত প্রচারিত হলো। এ ব্রত কল্লে কুলে কলঙ্ক হয় না, চিরকাল কুল উজ্জ্বল থাকে।

প্রণাম— ওঁ কুলদেবং নমস্তভ্যং সর্ব্বদা ভক্তবৎসলঃ।
ভক্তিমুক্তিপ্রদো নিত্যং তস্মৈ নিত্যং নমোনমঃ॥

নাটাই ব্রত।

অবিবাহিত বালকবালিকার বিশেষতঃ অনূঢ়া কন্যার শুভ বিবাহ কামনা করিয়া কুলবতীগণ অগ্রহায়ণ মাসের প্রতি রবিবারে সায়াহ্নে এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। অনূঢ়া কন্যার সংখ্যা বেশী না হইলে, কিম্বা গৃহে "অরক্ষণীয়া" কন্যা না থাকিলে দুই এক রবিবারে ব্রত না করিলেও চলে। বলাবাহুল্য, ঘরে অবিবাহিতা বালিকা না থাকিলে নাটাই ঠাকুরাণীর প্রতি কেবল অতীতকৃপাজনিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নিমিত্ত কেহ ব্রতানুষ্ঠান আবশ্যক মনে করেন না। এতদ্দেশে ব্রাহ্মণ সমাজে কন্যার সংখ্যা অল্প। কিন্তু বৈদ্য ও কায়স্থ সমাজে কাহাকেও পুত্রের বিবাহের জন্য বিশেষ বিব্রত হইতে হয় না।

অন্তঃপুরের প্রাঙ্গণে পূজাস্থল বিচিত্র আলিপনায় সুশোভিত হইয়া থাকে। মধ্যস্থলে এক চতুষ্কোণ ক্ষুদ্র "পুকুর" খনন করা হয়। উহার ভিতর নাটাই ঠাকুরাণী সশরীরে বিরাজমানা থাকেন। আলিপনার সাধারণ চিত্রের একটী নমুনা ৮৭ পৃষ্ঠায় দেওয়া গেল।

সুনিপুণা মহিলাগণ উদ্ধৃত সাধারণ আলিম্পনের কিয়দংশ পরিবর্ত্তন ও পরিমার্জ্জন পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে নানাবিধ সূক্ষ্ম কার্য্যের অবতারণা করিয়া চিত্র-বৈচিত্র্য প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

সাতটী ছোট কচুপাতা লইয়া একটীর উপর আর একটী রাখিবে। যে পাতাটী অপেক্ষাকৃত সকলের বড় তাহা সর্ব্বনিম্নে, এইরূপ ক্রমান্বয়ে যেটী সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র তাহা সর্ব্বোপরি রাখিবে। তারপর ঐরূপ ক্রমে সজ্জিত সাতটী তুলসী পত্র কচুপাতা গুলির

উপর স্থাপন করিবে। অতঃপর তুলসী পত্রের উপরে সাতগাছি দুর্ব্বা দিবে। এই তিন স্তর একত্র এক "ভাগ" হইল। যতজন বালক বালিকার শুভবিবাহ কামনা করিবে ঐরূপ তত "ভাগ" করিতে হইবে। এইগুলি কদলী পত্রের উপর স্থাপন করিতে হয়।

ইহা ব্যতীত, ভিজা চা'ল শিলে পিষিয়া প্রত্যেক বালক বালিকার জন্য সাতখানি ক্ষুদ্র চাপাটি প্রস্তুত করিবে। উহার তিনটে লবণ বর্জ্জিত, আর চারিটায় নুন সংযোগ করা হইয়া থাকে। ব্রতকথা শ্রবণের পর সরলমতি শিশুগণ উৎসাহ সহকারে ঐ চাপাটি ভক্ষণ করে। উভয়বিধ চাপাটি একপাত্রে মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হয়। সর্ব্বাগ্রে লবণ সংযুক্ত চাপাটি তুলিয়া ভক্ষণ করিতে পারিলে শীঘ্র প্রজাপতির কৃপা লাভ হইবে, এরূপ মেয়েলী শাস্ত্রের নির্দ্দেশ। শিশুদের মধ্যে যাহারা কিঞ্চিৎ বয়স্ক তাহাদের কাহাকে রহস্যপ্রিয়া রমণী জিজ্ঞাসা করিলেন, আগে নুনের চাপাটি খেয়েছ তো? উত্তর। তা আমি মনে রেখেছি কি না।

প্রঃ। তবে বোঝা গেছে, আলুনি খেয়েছ!

উঃ। তাই আমি বল্লেম কি না।

প্রঃ। তবে হয়েছে। তোমার কপাল ভাল, নুন খেয়েছ। তা বলতে হয়!

উঃ। (অধোদৃষ্টি ও নীরব।)

এ ব্রতে পুরোহিত আবশ্যক হয় না। গৃহকর্ত্রী সায়ংকালে স্বয়ং নাটাই দেবীর পূজা করেন। পূজান্তে সমবেত বালক বালিকাগণ আগ্রহ সহকারে কথা শ্রবণ করে।

আলিপনার নমুনা।
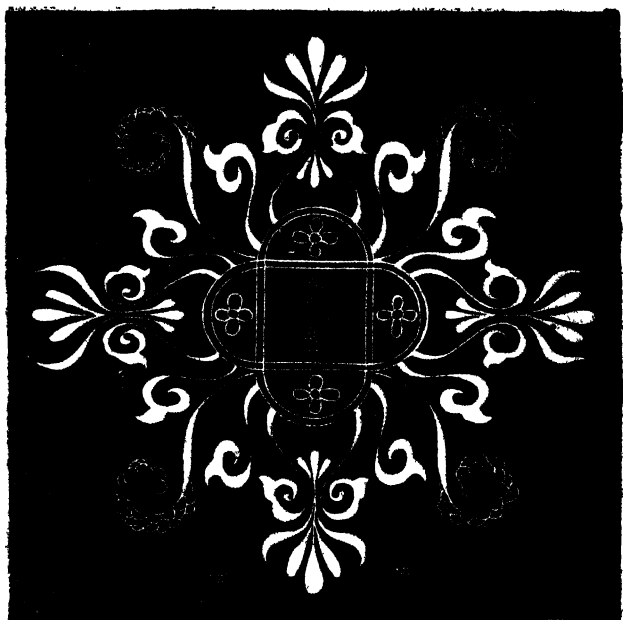
[৮৫ পৃষ্ঠা দেখ।]

নাটাই ব্রত কথা।

এক ছিলেন ধনপতি সওদাগর। তাঁর স্ত্রী, দু'টী সুন্দর ছোট ছেলে ও মেয়ে রেখে, হঠাৎ মারা যান। কিছু দিন পর, সওদাগর আবার সংসার করলেন। দ্বিতীয় পক্ষেও একটী ছেলে ও একটী মেয়ে হলো। মা-মরা শিশু দু'টীকে বাপ বড় ভাল বাসতেন। আর, পাড়া পড়শীরা টুকটুকে সুন্দর ছেলে মেয়ে দু'টীকে দেখলেই আদর ক'রে কোলে তুলে নিত। তাই দেখে,

নূতন গিন্নি ভাবলেন, হা অদেষ্ট, এ অভাগীর পেটে হয়েছে ব'লেই আমার বাছাদের এত হতাদর। এক বাড়ীতে চা'রটী ভাই বোন্; তারা যদি সকলে সমান না হবে তবে লোকে আমাকে ওদের সকলকেই নিজের পেটের ছেলের মতন দেখতে বলে কেন ?

একদিন গিন্নি এসে ধনপতিকে বল্লেন, কেবল বাড়ীতে বসে থাকলে তো আর সংসার চলবে না। শুনছি, সব সওদাগরেরা বিদেশে বণিজ্যে যাচ্ছে; তুমিও তাদের সঙ্গে যাও না কেন ? ছেলে মেয়ে কোলে ক'রে বসে থাকা পুরুষ মানুষের কাজ নয়। তাই শুনে, ধনপতির ভাবনা বেড়ে গেল। কারণ, নূতন গিন্নি যে, বাড়ীতে খাবার এলে, লুকিয়ে আম সন্দেশ নিজের ছেলে মেয়েদের হাতে এক একটী বেশী দিতেন, তাহা তাঁর জানবার বাকী ছিল না। এজন্য বিদেশে যেতে হবে ভেবে, বড় ছেলে ও বড় মেয়েটীর জন্যে তাঁর প্রাণ কাঁদতে লাগলো। কিন্তু বিদেশে না গেলেও তো নয়; আগে রোজগার, তার পরে সব।

সাত পাঁচ ভেবে, ধনপতি বিদেশে যাওয়াই স্থির করলেন। যাবার আগে গোপনে মুদী, গয়লা, মেঠাইওয়ালা ও সব দোকানীদের কাছে গিয়ে বল্লেন, ভাই তোমরা আমার বড় ছেলে মেয়েদের দেখো। তারা যা চাইবে তাই দেবে, তাতে কোন আপত্তি করো না, আমি ফিরে এসেই হিসেব চুকিয়ে দেব। এই ব'লে তাদের হাতে কিছু আগাম টাকা গুঁজে দিলেন।

ছেলেটী বল্লে, বাবা তুমি কোথা যাবে, আমার জন্যে হীরের আংটী আনবে। মেয়েটী বল্লে, বাবা আমার জন্যে তবে মুক্তোর হার চাই। ধনপতি তাদের একত্র কোলে তুলে নিয়ে ছেলেকে

আদর করে বল্লেন, তোমার জন্যে রাঙা বউ আনবো। অমনি মেয়েটী বল্লে, তবে বাবা আমার জন্যে টুকটুকে বর নিয়ে এসো। ধনপতি চো'কের জলের সঙ্গে হেঁসে ছেলে মেয়েদের মুখ চুম্বন ক'রে কোল হতে নামিয়ে দিয়ে, মা চণ্ডীর নাম স্মরণ ক'রে নৌকায় উঠে বিদেশ যাত্রা করলেন।

সওদাগর-গিন্নি ভাবলেন, বড় ছেলেটা ও বড় মেয়েটার এত বাড়াবাড়ি ভাল নয়। ওরা সাজগোজ ক'রে বাড়ীতে ব'সে থাকলে আমার বাছাদের আদর যত্ন হবে না। বাড়ীর রাখাল ছোঁড়াটার পেছনে কম খরচ হয় না। এই ভেবে, রাখালকে ছাড়িয়ে দিয়ে তিনি তাদের ছাগল ও ভেড়া চরাতে দিলেন। দুই ভাই বোন্ ভোরে উঠে মাঠে যেতো, আর সন্ধ্যে বেলার বাড়ী এসে দু'মুঠা ভাত খেতো।

গিন্নির ভাবনা গেল না। আধ-পেটা খেয়েও সতীনের ছেলে মেয়ে হেসে খেলে বেড়াচ্ছে, আর আমার ছেলে মেয়েদের রোজ দু'বেলা ঘি দুধ খেতে দি, তবু বাছারা কেমন রোগা হয়ে শুকিয়ে যাচ্ছে! একদিন ছোট ছেলে ও মেয়ে বল্লে, মা আমরা দাদা ও দিদির সঙ্গে মাঠে বেড়াতে যাবো। মা বল্লেন, ষাট, তোরা কেন এই রোদে ওই হতচ্ছাড়াদের সঙ্গে গিয়ে খিদেয় কষ্ট পাবি। যা, ঘরে বসে খেলা করগে। তারা বল্লে, না মা আমাদের কোন কষ্ট হবে না; তুমি ব্যস্ত হয়ো না, আমরা বরং শীগ্‌গির বাড়ী ফিরে আসবো। এই ব'লে তারাও ওদের সঙ্গে ছাগল ভেড়া চরাতে গেল।

দুপুর চলে গেল, বিকেল হলো; তবু ছেলেরা বাড়ী এল না। বিলম্ব দেখে সওদাগর-গিন্নি নিজের ছেলে ও মেয়ের

জন্যে ব্যস্ত হয়ে বাড়ীর চা'ন্দিক ছুটোছুটি কোরছিলেন। কেন বাছাদের আজ ওই হতভাগা ছুটার সঙ্গে যেতে দিলুম। সারাদিন না খেয়ে দেয়ে বাছাদের মুখ না জানি কেমন শুকিয়ে গেছে। এই ভেবে তিনি তাদের জন্যে মুড়কি, চিড়ে ভাজা লাড়ু, বাতাসা হাতে ক'রে ব্যাকুল হয়ে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে পথের পানে চেয়ে রইলেন। এমন সময় সন্ধ্যার কিছু আগে, চা'র ভাইবোন বাড়ী ফিরে এলো। ছোট ছেলে ও মেয়ে দৌড়ে এসে বল্লে, মা, তোমার হাতের খাবারগুলো ফেলে দাও, আমরা ওসব আর কখনো খাব না। দাদা ও দিদির সঙ্গে গিয়ে আজ পেট পুরে যা খেয়েছি, এমন জিনিষ ঘরে কোন দিন চো'কেও দেখিনি। আজ তুপুর বেলা বাজারে দোকানীরা দাদা ও দিদিকে আদর ক'রে কত জিনিষ খেতে দিয়েছে তা আর কি বল্‌বো। দই দুধ ক্ষীর সর তো ছিলই, তা ছাড়া সন্দেশ, রসগোল্লা, পানতোয়া জিলিপি, অমৃতি, 'লালমোহন', 'ক্ষীরমোহন' আর কত যে খেয়েছি তার সব নাম আমরা জানিও না। দাদা ও দিদির একটা পয়সা দিতে হলো না। তারা রোজ এই সব খায়; আমরা রোজ তাদের সঙ্গে যাবো, তোমার মানা শুনবো না।

তাই শুনে গিন্নি গালে হাঁত দিয়ে ভাবতে লাগলেন। তিনি সব বুঝতে পারলেন। সেদিন রাত্রে তাঁর ঘুম হলো না। খুব ভোরে উঠে তিনি দোকানীদের ডাকিয়ে বল্লেন, দেখ, আমার বড় ছেলে ও বড় মেয়েকে তোমরা জল খাবার ও জিনিষপত্র ধারে দিচ্ছ, তা ভালোই। আমার পেটের ছেলে মেয়ে যেমন তারাও তেমন। তবে, একটা কথা তোমাদের জেনে রাখা

ভাল, এই জন্মেই তোমাদের ডাকিয়েছি। আজ কয় বছর বাবৎ সওদাগর বাড়ীতে নাই। যে দারুণ রোগ শরীরে নিয়ে তিনি বিদেশ যাত্রা করেছেন, তা তোমাদের না বলাই ভাল। ব্যারাম শরীরে তাঁকে আমি যেতে কত নিষেধ করেছিলেম। তিনি মানা শুনলেন না; বল্লেন, "হাতে একটী পয়সা নাই, বাণিজ্যে না বেরুলে ঘরে ব'সে কি খাব"। তারপর এ পর্য্যন্ত তাঁর খবর নাই। ভাবনায় আমার ঘুম হয় না। এদিকে তিনি রাজ্যের দেনা রেখে গেছেন। এর মধ্যে যদি একটা ভাল মন্দ খবর এসে পড়ে, তবে ঠিক জেনো, আমি তোমাদের কাছে একটী পয়সারও দায়ী হতে পারবো না।

দোকানীরা খাবার দেওয়া বন্ধ কল্লে। তারপর অনেক দিন চ'লে গেল। কিন্তু গিন্নির ভাবনা দূর হলো না। সতীনের ছেলে মেয়েরা বাড়ীতে আধ পেটা খেয়ে এখনও হেসে খেলে বেড়াচ্ছে! গিন্নি আর কত সইবেন? এবার তিনি নিজেই গরজ ক'রে ওদের সঙ্গে নিজের ছেলে মেয়েদের মাঠে পাঠিয়ে দিলেন।

গিন্নি সেদিন ব্যস্ত হয়ে পথের পানে চেয়ে ব'সে আছেন, এমনি সময় ছেলেরা বাড়ী ফিরে এলো। ছোট ছেলে ও মেয়ে দৌড়ে এসে বল্লে, মা, দাদা ও দিদির সঙ্গে গিয়ে আজ যা খেয়েছি তা আর কি বলবো। তার কাছে সন্দেশ রসগোল্লা কোথা লাগে! জঙ্গলের ভিতর গাছে এত সুন্দর ও মিষ্টি পাকা ফল ঝুলে রয়েচে তা দেখলে চো'ক জুড়ায়, আর একবার মুখে দিলে আর কিছুই খেতে সাধ হবে না। আমরা ফলের নাম জানি না, বোধ হয় 'অমৃত ফল' হবে। এই দেখ, একটী ফল লুকিয়ে

নিয়ে এসেছি। এই ব'লে ছোট মেয়ে একটা সুন্দর টুকটুকে লাল ফল মা'র হাতে দিলে।

গিন্নি আশ্চর্য্য হয়ে দেখলেন, 'অমৃত ফল' বা আমও নয়, একেবারে 'মোক্ষ ফল'! তিনি মাথায় হাত দিয়ে একেবারে ব'সে পড়লেন। হা অদেষ্ট, যে ফল দেবতার ভোগের জন্যে সৃষ্টি হয়েছে, তা খেতে এই পৃথিবীর ভিতর আর লোক ছিল না! রাজা মহারাজারা খেলে না, আমার ছেলে মেয়েরা খেলে না, আমিও খেলুম না, আর খেলে কি-না আমার সতীনের ছেলে মেয়েরা! হা বিধাতা, আমার মনে কষ্ট দিয়ে তোমার আশ মিটে না! সে দিন রাত্রে গিন্নির ঘুম হলো না। মনে দারুণ রাগ হলো। রাত্রি পোহাইবার অপেক্ষায় জ্বরো রোগীর ন্যায় ছট্‌ফট্ করতে লাগলেন। খুব ভোরে উঠে, মুড় খ্যাংড়া হাতে নিয়ে দৌড়ে বনের ভিতর গেলেন। 'মোক্ষ ফলের' প্রতি ঝাঁটা উত্তোলন ও আস্ফালন ক'রে অভিশাপ দিলেন, পূর্ব্বদিকে সূর্য্য ঠাকুর তুমি সাক্ষী, যদি আমি সতী মায়ের গর্ভে জন্মলাভ ক'রে থাকি, যদি আমার ঊর্দ্ধকুলে কেউ সতী থাকে, তবে পৃথিবীতে এই ফল সকলের অভক্ষ্য হউক, বাহিরে যেমন আছে তেমনি থাক্, ভিতর ভস্মবৎ হউক। সতীত্বের অভিসম্পাত সফল হলো। সেই অবধি মোক্ষফল পৃথিবীতে 'মাকাল ফল' নামে পরিচিত হলো।

তার পর আবার অনেক দিন চ'লে গেল। কিন্তু সপত্নী সন্তানদের শ্রীবৃদ্ধি ও সওদাগর-গৃহিণীর মনোকষ্ট কিছুতেই দূর হলো না। আবারও তিনি নিজের ছেলে মেয়েদের গোয়েন্দা করে জানতে পারলেন তারা এখন আর কিছু না পেয়ে গৃহস্থের

ক্ষেতের গম খেয়ে ক্ষুধা দূর করে। তখনকার গম অতি সুস্বাদু ছিল ও সহজেই ভিতরের শাঁস চিবিয়ে খাওয়া যেতো। গিন্নির সহ্য হলো না। তিনি শাপ দিলেন, আজ হ'তে গমের ছাল পুরু হোক, ঢেঁকিতে পার দিয়ে ময়দা না ক'রে কেউ খেতে পারবে না। অভিশাপ সফল হলো। সতীত্বের অভিসম্পাত শকুনের শাপ নয়।

তার পর দিন, দুই ভাই ভগিনী ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণের আর উপায় না দেখে অস্থির হয়ে বনে বনে বেড়াতে লাগলো। তাদের ছাগমেষ হারিয়ে গেল, সন্ধ্যা হলো, তবু খুঁজে পাওয়া গেল না। ছোট বোন বল্লে, দাদা, কি সাহসে আর বাড়ী গিয়ে মুখ দেখাবে? ওই দূরে গৃহস্থের বাড়ীতে আলো দেখা যাচ্ছে, চল তাদের আশ্রয়ে রাত্রি কাটিয়ে তারপর যদি সারাদিন খুঁজে ছাগলভেড়া পাওয়া যায় তবেই কাল এক সময়ে বাড়ী যাব।

সেদিন অগ্রহায়ণ মাসের রবিবার। গৃহস্থদের মেয়েরা ছোট ছোট ছেলেপুলে সঙ্গে ক'রে নাটাই ব্রত কোরছিলেন। ব্রতের উলুধ্বনি ও আলো লক্ষ্য ক'রে দুই ভাই বোন্ তাঁদের বাড়ীর পাশে এসে দাঁড়ালো। বাড়ীর ভিতর যেতে লজ্জা বোধ হলো। এদিকে গৃহস্থ বাড়ীর মেয়েরা আশ্চর্য্য হয়ে দেখলেন তাঁদের ব্রতের চার "ভাগ" কচু ও তুলসী পাতা ছয় 'ভাগ' হয়েছে; চার 'ভাগ' চাপাটি ছয় ভাগ হয়ে গেছে। তাঁরা বলাবলি করতে লাগলেন, আমাদের বাড়ীতে চা'টি ছেলে মেয়ে বই তো নয়, আর দুটী কোত্থেকে এলো? তখনি খোঁজ ক'রে জানা গেল ধনপতি সওদাগরের দুটী ছেলে মেয়ে বাড়ীর পেছনে দাঁড়িয়ে-

রয়েছে। অমনি চিনতে পেরে তাদের সকলে বাড়ীর ভেতর নিয়ে এলেন।

তাদের কষ্টের কথা সব শুনে গেরস্ত বাড়ীর গিন্নির বড় দয়া হ'লো। চোখের জল আঁচলে মুছে দুঃখ করে বল্লেন, আহা এমন সোণারচাঁদ ছেলে মেয়ে! ঘরে বাপ নাই, মা-মরা শিশুদের প্রতি এমন কুব্যবহার মানুষেও করতে পারে! এদের বিমাতা তো নয়, রাক্ষসী। আরও তো কত ঘরে ঘরে সৎমা আছে, সকলে তো অমন নয়। ও পাড়ার বামুন দিদির বড় দু'ছেলেকে দেখে কারুর বলবার সাধ্য নাই যে তারা তাঁর নিজের পেটের ছেলে নয়। ছেলেদের প্রতি তাঁর কত আদর যত্ন। একদিন ছেলেরা দুষ্টুমি করেছিল ব'লে তিনি বকেছিলেন। তাই দেখে নাপিত বৌ বল্লে, আহা, তুমি ওদের বকো ঝকো না, লোকে শুনে কি বলবে। তাই শুনে বামুনদিদি বল্লেন, আমি তো ওদের লোক-দেখানো আদর করি না। পরের ছেলে হ'লেই দুষ্টুমি দেখেও কিছু বলতুম না; ওরা যে আমার আপন ছেলে। বামুন দিদির সুখ্যাত লোকের মুখে আর ধরে না। আমি ঠিক বোলচি সওদাগর গিন্নির কখনো ভাল হবে না।

বাড়ীর অন্য মেয়েরা বল্লেন, আর তোমাদের ভাবনা নাই; নাটাই ঠাকুরুণ তোমাদের প্রতি মুখ তুলে চেয়েছেন। আমাদের যেন মনে হচ্ছে, তোমাদের ভালোর জন্যে তিনিই তোমাদের আজ দিনের বেলা উপবাস ব্যবস্থা করে রেখেছেন, কারণ উপোস ক'রে বারব্রত ও পূজো কল্লে হাতে হাতে ফল লাভ হয়। এই ব'লে তাঁরা সওদাগরের ছেলে মেয়েকে সমাদর ক'রে ব্রত করালেন। ব্রত শেষে তারা প্রণাম ক'রে বর প্রার্থনা কল্লে, নাটাই

ঠাকুরাণি! আর আমাদের কষ্ট দিও না, কা'ল যেন ছাগল ও ভেড়া খুঁজে পাই; নইলে মা'র কাছে আমরা আর মুখ দেখাতে পারবো না। তাই শুনে সকলে হেসে বল্লেন, এ কি রকম বর চাওয়া হলো! তাঁরা মেয়েটীর দিকে তাকিয়ে বল্লেন, যদি বর চাইতে হয় তবে (বিয়ের) বরই চাও। তোমরা দু'জনে এই বর মাগ, ভেয়ের জন্যে বৌ আর বোনের জন্যে বর সঙ্গে ক'রে বিদেশ থেকে বাপ শীগ্‌গির ফিরে আসুন।

রাত্রে আহারের পর বাড়ীর মেয়েরা বল্লেন, নাটাই ঠাক্‌রুণের আশীর্ব্বাদে কা'ল তোমাদের নিশ্চয়ই সুপ্রভাত হবে। আমরা গরীব মানুষ, তোমাদের জন্যে তাড়াতাড়ি বেশী রকম খাবার আয়োজন করতে পাল্লেম না; আমাদের ত্রুটী গ্রহণ করো না। সওদাগরের ছেলে ও মেয়ে বল্লে, আজ অসময়ে পড়ে তোমাদের নুন খেয়েছি, চিরকাল তোমাদের গুণ ও নাটাই ব্রতের কথা মনে থাকবে।

পরদিন ভোরে উঠে সকলে দেখলেন, ছাগল ও ভেড়া ঘরের পেছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর তখনি খবর পাওয়া গেল দেশের সওদাগরদের অনেক নৌকা বিদেশ থেকে বাড়ী আসছে। তাই শুনে ছাগল ও ভেড়া রেখে দুই ভাই বোন নদী তীরে ছুটে গেল। এক খানির পর আর এক খানি ক'রে অনেকগুলি সুন্দর পণ্য-বোঝাই নৌকা, গুন টেনে ধীরে ধীরে গ্রামের দিকে আসছিল। তারা একে একে সব নৌকার মাঝিদের ডেকে জিজ্ঞেস কল্লে, ধনপতি সওদাগরের নৌকা কোথায়? কেউ বল্লে, দশ নৌকার পর; আবার কেউ বল্লে, পাঁচ নৌকার পর। তার পর ধনপতি সওদাগরের নৌকা এসে পঁহুছিল।

অনেক বছর পর ধনপতি দেশে ফিরে আসচেন। বাড়ীর জন্যে তাঁর মন ব্যাকুল হয়েছে। ছেলে মেয়েরা কেমন আছে, তাদের এখন কত বড় দেখাবে, অনেক দিন তাঁকে না দেখে গিন্নির স্বভাব এখন অবিশ্যি বদলে গেছে, এইরূপ অনেক কথা তাঁহার মনে উদয় হইতেছিল। নৌকার ভিতর থেকে মুখ বাড়িয়ে তিনি পরিচিত রাস্তাঘাট, গাছপালা, বাড়ীঘর ইত্যাদি দেখে আনন্দ উপভোগ কোরছিলেন। আবার কোন স্থানে নুতন শ্মশান চিহ্ন দেখে তাঁর মন কেঁপে উঠছিল। এইরূপে যেতে যেতে, কতকদূরে তিনি নিজের ছেলে মেয়েদের দেখে, অমনি নৌকা হ'তে লাফ দিয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে তাদের বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

ধনপতির সঙ্গে আরও তিন চার খানি নৌকা ছিল। তিনি বিদেশ থেকে অনেক ধনরত্ন সঙ্গে এনেছেন। নৌকার ভিতরে এনে তিনি ছেলেকে হীরের আংটি ও মেয়েকে গজমুক্তার হার পরিয়ে তাদের মুখ চুম্বন ক'রে বল্লেন, তোমাদের জন্যে এর চেয়ে আরও সুন্দর জিনিষ এনেছি! তারা অমনি আগ্রহ ক'রে জিজ্ঞেস কল্লে, আর কি এনেছ বাবা? সওদাগর আদর করে বল্লেন, তোমার জন্যে রাঙা বউ, আর তোমার জন্যে টুকটুকে বর। তাই শুনে দু'ভাই বোঁন লজ্জায় অবনত হলো। এখন তারা একটু বড় হয়েছে!

এদিকে বাড়ীতে সওদাগর গিন্নি ভাবচেন, সতীনের ছেলেরা গেল কোথায়? ছাগল ভেড়া ও ফিরে এল না! নিশ্চয়ই তারা ফল খুঁজতে গিয়ে বনের ভিতর বাঘ ভালুকের হাতে মারা পড়েছে। আহা, যদি বেঁচে থাকতো তবে ওদের দিয়ে সংসারের

কত কাজকর্ম্ম হ'তে পারতো! এই ব'লে তিনি নিজের ছেলে মেয়েদের ডেকে খুব সাবধান ক'রে দিলেন, গ্রামে বাঘের ভয়, তোমরা কখনো ঘরের বাইরে যেও না।

ধনপতির নৌকা ঘাটে এসে পঁহুছিল। খবর পেয়ে, গিন্নি গালে হাত দিয়ে ভাবতে লাগলেন। সওদাগর যে বিদেশ থেকে বিনা সংবাদে সুস্থ শরীরে হঠাৎ বাড়ী আসবেন, তার জন্যে তিনি তখন প্রস্তুত ছিলেন না। বড় ছেলে মেয়েদের না দেখে তিনি কি মনে করবেন, আর আমিই বা কি বলি! আর সময় নাই; গিন্নি তখনি ধুলায় পড়ে চেঁচিয়ে কাঁদতে লাগ্‌লেন। আমার কি হলো গো! আমি কেন বাছাদের যেতে দিলুম। আমি কত বল্লুম, গাঁয়ে বাঘ এসেছে, চা'র ভাই বোন ঘরে বসে একত্র খেলা কর। আমার কথা কিছুতেই শুনলে না গো! আমার এরাও যেমন তারাও তেমন ছিল; পেটের ছেলের মতন দু'জনে আমায় কত ভক্তি করতো! আমার কত সাধ ছিল, বড় দু' ছেলে মেয়ের এ বছরই বিয়ে দেবো; বিদেশ থেকে সওদাগর এসে নাতি নাতনী দেখে কত সুখী হবেন! আমার সব সাধ দূর হলো গো! আমার এখন বেঁচে থেকে লাভ কি; আমায় বিষ এনে দাও, আমি আজই মরবো। আমার এ শোক সহ্য হয় না!

গিন্নির মায়াকান্না শুনে ধনপতির বড় রাগ হলো। তিনি রাগ গোপন ক'রে স্ত্রীর কাছে এসে সান্ত্বনার ছলে বল্লেন, যা হবার তা হয়েছে, আর মিছে শোক ক'রে ফল কি। আমার এই আফিমের কৌটটি তোমার বাক্সে রেখে দাও। ছেলেপুলের, খবর, সাবধান! এটা বিষ। বিষের কথা শুনে গিন্নির বড়

ভয় হলো। তিনি চমকে উঠে চোক তুলে বল্লেন, না না, ও তোমার জিনিস তোমার ঠেঁয়ে থাক্; আমি কোথায় হারিয়ে ফেলবো। এই ব'লে, গিন্নির শোক আবার উথলে উঠলো। ওহো-হোঃ! আমি কি আর এখন বাক্স খুলতে পারবো গো! আমি যে তাদের কত কাপড়, জামা ও খেলনা কিনে দিয়েছি, সবই তো আমার বাক্সে আছে, তা আমি এখন কেমন ক'রে দেখবো গো!

আঁচলে মুখ মুছে গিন্নি শান্ত হলেন। ধনপতি ভাবলেন, বড় ছেলে মেয়েকে ও তাদের বর-কনেকে আজ হঠাৎ নৌকা থেকে বা'র ক'রে কাজ নাই; এই রাক্ষসীর রঙ্গ আরও একটা দিন দেখা যাক। সে দিন তিন চার নৌকা থেকে বাণিজ্যের জিনিসপত্র মণিমুক্তো জহরত ঘরে তুলতে তুলতে অনেক রাত হয়ে গেল। গিন্নির মনের ভিতর আনন্দের সীমা নাই। এত ধন দৌলত! এ সবই আমার নিজের ছেলে মেয়েরা পাবে। সওদাগর বিদেশে গিয়ে বুড়ো বয়সে আফিম ধরেছেন; কখন কি হয় বলা যায় না। এই সময় কিছু টাকাকড়ি নিজের কাছে লুকিয়ে রাখলে অসময়ে কাজে লাগবে। এই ভেবে তিনি বেশী রাত্রে চুপে চুপে বিছানা হতে উঠলেন। বাড়ীর পাশে অনেক দিনের পুরাণো এক পাতকুয়ো ছিল। তিনি তার ভেতর অনেক সোণারূপো, মণিমুক্তো ও টাকার তোড়া ফেলতে লাগলেন। কিন্তু বিধাতার নির্ব্বন্ধ! খুব আঁধার রাত, গিন্নি পা ফসকে পাতকুয়োর ভেতর পড়ে গেলেন।

পরদিন সকালবেলা গিন্নির অপমৃত্যু ও অপমৃত্যুর কারণ প্রকাশ হয়ে পড়লো। কারুর মনে বিশেষ দুঃখ নাই। কিন্তু

ধনপতির চো'কে দু ফোঁটা জল দেখা দিল। হাজার হোক, তাঁর স্ত্রী। ভাল শিক্ষা পেলে এতদূর দুর্গতি হতো না।

কিছু দিন পরেই ধনপতি খুব ঘটা ক'রে বড় ছেলে মেয়েদের বিয়ে দিলেন। কুটুম্ব ও লোকজনে বাড়ী ভরে গেল। সেই গেরস্ত বাড়ীর গিন্নির ও মেয়েছেলেদের খুব আগ্রহ ক'রে নিমন্ত্রণ করা হলো। সারা দিনরাত কেবল খাওয়া দাওয়ার ব্যাপার। গাঁয়ের প্রাচীন লোকেরা বলাবলি করতে লাগলো, ধনপতি যা কল্লে এমন ঘটাঘটি তারা কখনো দেখে নাই, শোনেও নাই। কিন্তু এত আনন্দ কোলাহলের ভিতরেও ধনপতির চো'কে জল। আজ তাঁর গুণবতী বড় গিন্নির কথা মনে পড়েছে!

সওদাগরের মেয়েটীর নাম ধনপৎ-কুমারী। রাত বেশী হয়েছে, বাসর ঘরে এখন কেউ নাই। ধনপৎকুমারী ও তাঁর বর শ্রীমন্তকুমার নিদ্রার ভাণ করে শুয়ে আছেন, এখনো তাঁদের দু'জনে কথা হয়নি। শ্রীমন্ত বড় লাজুক, প্রথম কি বোলবেন ভেবে পাচ্ছেন না। এমনি সময়ে কুমারীর হঠাৎ নাটাই ব্রতের কথা মনে পড়ে গেল। সেদিন অগ্রহায়ণ মাসের শেষ রবিবার। যে ব্রতের পুণ্যিতে আমাদের এত হলো, আজ আমি সেই ব্রত ভুলে গেছি! এই ভেবে তিনি তাড়াতাড়ি উঠলেন। বরণের ডালায় পিটুলি, দুর্ব্বা ও ফুলের মালা ছিল। পিটুলি দিয়ে প্রদীপের শীষে চাপাটি তয়ের ক'রে নাটাই ঠাকুরুণের পূজো ও প্রণাম করলেন। শ্রীমন্তকুমার শুয়ে শুয়ে সব দেখছিলেন। প্রদীপের আলোয় মুখখানি ভাল ক'রে দেখতে পেয়ে তিনি ভাবলেন, আহা কি সুন্দর মুখ! কি সুন্দর চো'ক! তিনি আবার ভাবলেন, এত রাত্তিরে পিটুলি দিয়ে পুতুলখেলা কেন?

ভালই হলো, এখনি জিজ্ঞেস কচ্চি; এতক্ষণ পর কথা কইবার বেশ সুবিধে হলো। তখন ব্রত শেষ করে ধনপৎকুমারী প্রদীপ নিবিয়ে দিলেন। অমনি তাঁরা আশ্চর্য্য হয়ে দেখলেন, ভোর হয়েছে! ঘরের চা'দ্দিকে মেয়েদের পায়ের শব্দ! শ্রীমন্ত নিরাশ হলেন, আর কথা কওয়া হলো না।

পরদিন বাসি-বিয়ের পর ধনপৎকুমারী বরের সঙ্গে নৌকায় উঠে শ্বশুর বাড়ী চল্লেন। নৌকার ভিতর প্রথম কথা কওয়ার সুযোগ খুঁজে শ্রীমন্ত বল্লেন, কাল এত রাত্রে তুমি কি কোরছিলে? কুমারী লজ্জায় মাথা হেঁট করে ধীরে ধীরে বল্লেন, "নাটাই ব্রত কোরছিলুম।" শ্রীমন্ত জিজ্ঞেস কল্লেন, এ ব্রত কল্লে কি হয়? কুমারীর ক্রমেই সাহস হলো; তিনি উত্তর কল্লেন, এ ব্রত কল্লে সব হয়। এ ব্রত কল্লে যে যা চায়, সে তাই পায়। তাই শুনে শ্রীমন্ত রহস্য ক'রে হেসে বল্লেন, তোমার ব্রত কল্লে দেখছি 'হারাণো গোরু'ও পাওয়া যায়। ধনপৎকুমারী এবার মাথা তুলে বল্লেন, হাঁ, ঠিক কথা, আমার নাটাই ঠাকরুণের কৃপায়, গোরু ছাগল ভেড়া হারিয়ে গেলে আর খুঁজতে হয় না, পরদিন ভোরে তারা নিজেই বাড়ী ফিরে আসে। শ্রীমন্ত আবার রহস্য ক'রে বল্লেন, আচ্ছা, জিনিস হারিয়ে গেলে যদি আবার পাওয়া যায় তবে তোমার গলার ওই সুন্দর গজমুক্তোর হার, হাতের হীরের বালা ও আরো কএকখানি গহনা দাও, এই পাণের ডিবেয় বন্ধ করে নদীতে ফেলে দি, সাতদিন পরে বাড়ী পঁহুছে গহনাগুলো আবার তোমার কাছে দেখতে চাই। নাটাই ঠাকরুণের বড়াই এবার বোঝা যাবে। কেমন? রাজী আছ? ধনপৎকুমারী আর কথাটি না কোয়ে, তখনি হার, বালা ও গায়ের

অনেক গহনা খুলে পাণের ডিবেয় বন্ধ ক'রে "জয় নাটাই ঠাক্‌রুণের জয়" ব'লে নদীর জলে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। শ্রীমন্ত আশ্চর্য্য হয়ে বল্লেন, কল্লে কি! কল্লে কি! আমি শুধু রহস্য ক'রে বোলছিলেম বই তো নয়!

সাত দিন পরে তাঁরা বাড়ী পঁহুছিলেন। আজ বৌভাত। অনেক লোকের নেমন্তন্ন। কিন্তু অনেক চেষ্টা ক'রে কোথাও মাছ পাওয়া গেল না। এখন উপায়! শ্বশুর বড় ভাবনায় পড়লেন। তখন বউ শ্বশুরকে ব'লে পাঠালেন, আপনার কোন চিন্তা নাই; নাটাই ঠাকুরুণকে স্মরণ ক'রে জেলেরা নদীতে জাল ফেলুক, তা হ'লে অনেক মাছ পাওয়া যাবে। জেলেরা তাই কল্লে। আর তখনি তারা একটা পাঁচ মণ ভারি 'রাঘব বোয়াল' মাছ সকলে মিলে বয়ে নিয়ে এসে, গা মুছে, গামোছার বাতাস খেতে লাগলো। সকলে দেখে অবাক! এত বড় মাছ কেউ কুটতে সাহস কল্লে না। বউ বল্লেন, আমিই কুটবো। বউ বঁটি নিয়ে মাছের গলা অর্দ্ধেক কাটতেই সেই রূপোর বড় পাণের ডিবে বেরিয়ে পড়লো! তার ভেতর বৌয়ের সব গহনা পাওয়া গেল। শ্রীমন্তের মুখে সকলে ঘটনা শুনে আশ্চর্য্য হয়ে বলাবলি করতে লাগলেন, ইনি তো বউ নন, স্বয়ং লক্ষ্মী! সেই দিন থেকে নাটাই ব্রতের কথা শ্বশুরের দেশেও ঘরে ঘরে প্রচার হয়ে গেল।

কএক বছর পর ধনপৎকুমারীর এক সুন্দর ছেলে হলো। তাঁর শ্বশুর খুব ঘটা ক'রে নাতির অন্নপ্রাশনের উয্যুগ করলেন। কিন্তু শ্বশুরের মনে সুখ নাই। গাঁয়ে খুব জলকষ্ট দেখে তিনি অনেক টাকা খরচ ক'রে এক পুকুর কাটিয়েছিলেন, কিন্তু তাতে কিছুতেই

জল উঠলো না। জলাশয় প্রতিষ্ঠা ক'রে পুণ্য সঞ্চয় করবেন, বহুদিনের আশা বিফল হলো। কি দারুণ পাপে এমন হলো ভাবতে ভাবতে বুড়ো সওদাগরের প্রায়ই ঘুম হতো না। তার পর অন্নপ্রাশনের আগের দিন রাত্রে তিনি যে স্বপ্ন দেখলেন, তাতে তাঁর প্রাণ যেন উড়ে গেল। স্বপ্ন দেখলেন, "যদি নরকের ভয় থাকে, তবে কাল অন্নপ্রাশনের পর নাতিকে কেটে পুকুরে ফেলবে, তা হ'লে জল উঠবে ও পরকালে তোমার অক্ষয় স্বর্গলাভ হবে।" এই দারুণ স্বপ্ন দেখে বুড়ো সওদাগরের চো'কের জলে বালিস ভিজে গেল। আজ তাঁর বাড়ীতে ক্রিয়া, অনেক বেলা হয়ে গেল তবু তিনি বিছানা হতে উঠছেন না। নহবৎ ও সানাই তাঁর কাণে বিষ ঢেলে দিতে লাগলো। তিনি বিছানায় ছটফট করতে লাগলেন। ব্যস্ত হয়ে শ্রীমন্ত বাপের কাছে গেলেন। অনেক কষ্টে সওদাগর মুখে তুলে বল্লেন, যে ভীষণ স্বপ্ন দেখেছি তা কারু কাছে বোলবার নয়, শোনবারও নয়। আমি ঘোর পাপী, আমার নরকে বাস হোক, সেই ভাল, আর এ মুখ কা'কেও দেখাবো না। তারপর তিনি ছেলেকে স্বপ্নের কথা গোপনে বল্লেন। চো'কের জলে তাঁর বুক ভেসে গেল।

শ্রীমন্ত মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। আজ তাঁর হরিষে বিষাদ! তখনি সামলিয়ে আবার উঠে দাঁড়ালেন। চো'কের জল মুছে বাপকে বল্লেন, বাবা আজ আমি ধন্য হলেম! নরকের ভয় থেকে উদ্ধারের জন্যেই লোকে পুত্র পৌত্র কামনা করে। আপনার পৌত্রকে দিয়ে আপনার অক্ষয় স্বর্গবাস হবে, এর চাইতে আমার আনন্দের কথা আর কি হতে পারে! আজ আমার পরম সৌভাগ্য! আমার জন্ম সার্থক হলো! বাজা-

কর্ণের পুণ্যের কথা স্মরণ করুন। আপনি আর খেদ করবেন না, আপনার আশীর্ব্বাদে আমার আরো পুত্রলাভ হতে পারবে। আপনার স্বর্গ কামনা করে আজ আমি এই শিশু উৎসর্গ করবো। আপনি উঠুন, আপনার চো'কে জল দেখলে আমার অধর্ম্ম হবে। এই ব'লে শ্রীমন্ত বাপের পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে অন্নপ্রাশনের পর পুষ্করিণী উৎসর্গের জন্যে প্রস্তুত হ'তে চল্লেন।

শ্রীমন্ত ভাবলেন, এ কথা স্ত্রীকে বলে কাজ নেই। হাজার হোক, মায়ের প্রাণ। এ সংবাদ শুনে তিনি হাহাকার ক'রে উঠবেন, আর আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা হবে না। অন্নপ্রাশন হয়ে গেল পর তিনি ছেলেকে কোলে নিয়ে গোপনে পুকুর পাড়ে গেলেন। শ্রীহরির পাদপদ্মে শিশুকে মনে মনে নিবেদন ক'রে, সাহসে বুক বেঁধে, পিতার স্বর্গকামনায় শিশুকে দুখণ্ড ক'রে কেটে পুকুরে ফেলে দিলেন। অমনি এক নিমেষে পুকুরে জল উঠে ভ'রে গেল। [এই সময় কথক ঠাকুরাণী আলিপনার মধ্যাস্থিত "পুকুরে" একটী ফুল ছিঁড়িয়া ফেলিয়া উহা জলপূর্ণ করিয়া থাকেন। অন্য রমণীরা হুলুধ্বনি করেন।] পুকুরে হঠাৎ জল উঠেছে শু'নে গ্রামের লোকদের আনন্দের সীমা নাই। তখনি পুরুৎ ডেকে পূজো ক'রে পুকুরের প্রতিষ্ঠা করা হলো।

ধনপৎকুমারী সারাদিন রান্নাঘরে ছিলেন। অনেকক্ষণ শিশুকে না দেখে তাঁর মন চঞ্চল হয়ে উঠলো। তিনি দাসীদের বল্লেন, দুধ উঠে আমার বুক ভেসে যাচ্ছে, আমার ছেলে এনে দাও। তখন কেউ বল্লে ছেলেকে সে বাপের কোলে দেখেছে। কেউ বল্লে, ছেলে তার খুড়োর কাছে; আবার কেউ বল্লে ছেলে তাঁর ঠাকুর্দ্দার কোলে ঘুমুচ্ছে।

সন্ধ্যা হয়ে এলো। ধনপৎকুমারী ভাবলেন, শুনতে পাচ্ছি নূতন পুকুরে জল উঠেছে। আমার খোকার কত ভাগ্যি, তারই ভাতের দিনে এতকাল পর পুকুরে জল উঠলো। একবার পুকুরে গিয়ে গা ধুয়ে আসি। এই ব'লে তিনি পুকুর ঘাটে গেলেন। সে দিন অগ্রহায়ণ মাসের রবিবার। ধনপৎকুমারী পাড়াপড়শী মেয়েদের উলু শুনতে পেয়ে চমকে উঠলেন। যে ব্রতের পুণ্যিতে আমার এত হলো, আমি সেই ব্রত ভুলে গেছি! পুকুরপাড়ে পূজোর ফুল, দুর্ব্বা ও আলো চা'ল ছড়িয়ে পড়ে ছিল। তিনি তাই কুড়িয়ে তাড়াতাড়ি পিটুলির চাপাটি তয়ের করে ব্রত করলেন। অমনি নাটাই ঠাক্‌রুণ নিজ মূর্ত্তিতে প্রকাশ হলেন। তাঁর কোলে ধনপৎকুমারীর জীয়ন্ত ছেলে! দেবী রাগের ভাণ ক'রে কুমারীর গালে ঠোনা মেরে তার কোলে ছেলে দিলেন। আর বল্লেন, তোর ছেলেকে সেই কখন এরা কেটে পুকুরে ফেলেছে, আর এখন সন্ধ্যে হলো, এখনো তুই ছেলের খোঁজ কচ্চিসনে! আমি পুকুরের ভেতর আর কতক্ষণ তোর ছেলেকে কোলে নিয়ে ব'সে থাকবো। এই ব'লে নাটাই ঠাক্‌রুণ আকাশে মিশে গেলেন।

ধনপৎকুমারী ছেলে কোলে ক'রে এসে ঘরের মেজের ভিজে কাপড়ে শুয়ে রইলেন। তাঁর মনে বড় অভিমান হয়েছে; তাঁকে না বোলে কোয়ে এঁরা এমন ভয়ানক ছলনার কাজ ক'রে ফেল্লেন! তাঁর পাশে ব'সে, ঘরের দো'রে কপাটের শিকল নেড়ে, ছেলেটী হেঁসে হেঁসে খেলা কচ্ছিল। ছেলেকে দেখে সকলে যারপর নাই আশ্চর্য্য হয়ে দৌড়ে এল। শ্বশুর বল্লেন, মা! তুমি মানুষ না দেবতা? বাড়ীর উঠানে লোকে লোকা-

রণ্য হলো। নাটাই ঠাকুরুণের কৃপায় হারাণো জিনিস পাওয়া যায়; আবার ছেলেকে কেটে ফেল্লেও জীয়ন্ত ফিরে আসে,—শুনে সকলের ভক্তি উথলে উঠলো। নাটাই ঠাকুরুণের জয় জয়-কারে চা'ন্দিকে ছেয়ে গেল।

এ ব্রত কল্লে কি হয়? বিয়ে হয়। আর কি হয়? ছেলে হয়। আর কি হয়? হারাণো ধন পাওয়া যায়। আর কি হয়? সব হয়।

পাটাই ব্রত।

শাস্ত্রোক্ত পাষাণ-চতুর্দ্দশী ব্রতের রূপান্তর পাটাই ব্রত। 'পাষাণ দুর্গা' উপাস্য দেবতা। ইহা অগ্রহায়ণে করণীয়। কিন্তু উক্ত মাসে ব্রতসংখ্যার প্রাচুর্য্য বশতঃ ব্রাহ্মণেতর জাতীয়দের অনেকেই পৌষের শুক্লা চতুর্দ্দশীতে সায়ংকালে ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। কেহ কেহ মধ্যাহ্নে পূজা সমাপন করেন। ব্রত না হওয়া পর্য্যন্ত উপবাসে থাকিতে হয়। "আড়াই ব্যঞ্জন" ও অন্ন রন্ধন করিয়া দুই থালায় নৈবেদ্য সাজাইতে হয়। ঝোল, তরকারী ও ভাজা এই কয়টাকে "আড়াই ব্যঞ্জন" বলে। পূজান্তে এক থালা নৈবেদ্য ধোপানীর প্রাপ্য, অন্য থালা ভুঁইমালী পাইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত, সঙ্গতিপন্ন গৃহে পৌষ পার্ব্বণের ন্যায় পিষ্টক ও পরমান্নের বিপুল আয়োজন হইয়া থাকে। সুতরাং এ দিনের "আড়াই ব্যঞ্জন" প্রকৃত পক্ষে পঞ্চাশ ব্যঞ্জনের সমতুল্য।

বীরণ তৃণ (চলিত কথায় বেণাঘাস) সার্দ্ধ দুই হস্ত পরিমিত দীর্ঘাকারে জড়াইয়া লইবে। ইহারই নাম 'পাটাই'। যতজন রমণী ব্রত করিবেন ততটী পাটাই নির্ম্মাণ করিতে হয়। এইগুলি অন্তঃপুরের প্রাঙ্গণে ঘনসন্নিবিষ্ট করিয়া এক সারিতে রোপণ করিবে। সম্মুখে এক ক্ষুদ্র "পুকুর" করিয়া চতুঃপার্শ্বে আলিপনা দিবে। পাটাইগুলি সরিষাফুল ও গেঁদা ফুল দ্বারা সজ্জিত করা হয়।

নৈবেদ্যের অন্ন গৃহিনীরা স্বয়ং রন্ধন করেন বলিয়া কায়স্থদের গৃহে ব্রাহ্মণ পুরোহিতেরা এই ব্রতের পূজা করেন না। কিন্তু পুরোহিত উপস্থিত থাকিয়া মন্ত্র বলিয়া দেন, গৃহকর্ত্রী স্বয়ং পূজা করেন। ধ্যান যথা ;

ওঁ সিংহস্থা শশিশেখরা মরকতপ্রেক্ষা চতুর্ভির্ভুজৈঃ।
শঙ্খং চক্রধনুঃ শরাংশ্চ দধতী নেত্রৈস্ত্রিভিঃ শোভিতা॥
আমুক্তাঙ্গদহার কঙ্কণরণৎ কাঞ্চিক্কণ ন্নূপুরা।
দুর্গা দুর্গতি হারিণী ভবতু নো রত্নোল্লসৎকুণ্ডলা॥

পরদিন প্রত্যুষে কাক ডাকিবার পূর্ব্বে পাটাইগুলি প্রাঙ্গণ হইতে তুলিয়া পুকুর পাড়ে রোপণ করিতে হয়। ইহা ভুঁইমালীর কর্ত্তব্য।

পাটাই ব্রত কথা।

এক বিধবা বামুন ঠাকৃরুণ। তাঁর বৌয়ের ছেলে হয়ে বাঁচে না। বউটী দেখতে শুনতে মন্দ নয় ; তবে এক দোষ ছিল, বড় লোভ। দুধ জ্বাল দিয়ে লুকিয়ে সরটুক খেয়ে ফেলতেন। ব্রত-রজোর জন্যে ঘরে ভাল খাবার তৈরি হ'লে তাঁর নোলা

সগবগিয়ে উঠতো ; লুকিয়ে নৈবেদ্যের আগ খেয়ে ফেলতেন। শ্বাশুরী টের পেলে, বিড়ালে খেয়েছে ব'লে বুঝিয়ে দিতেন। জিভের দোষ তাঁর কিছুতেই গেল না। এজন্যে তাঁর উপোস করা হতো না, ব্রতের ফলও হতো না। এদিকে ষষ্ঠী ঠাকরুণ তাঁর বাহন বিড়ালের উপর মিছে বদনাম শুনে কুপিত হলেন। ফলে, বৌয়ের ভাল হলো না। তাঁর সন্তান হয়ে বাঁচতো না। মাদুলি তাবিজ কবচ সবই বৃথা হলো।

অগ্রহায়ণ (অথবা পৌষ) মাস, কা'ল বাড়ীতে পাটাই ব্রত। ব্রাহ্মণীর রাত্রে ঘুম হলো না। তিনি অনেক ভেবে চিন্তে স্থির করিলেন, বউকে কোন কাজে আটকে রাখবো যাতে সে সারাদিন উপোস ক'রে থাকে, আর ঘরে ব্রতের আয়োজন টের না পায়। এই ভেবে ঘরে যত ময়লা কাপড় ছিল তাতে তিনি তেল ও কালী মেখে রাখলেন। ভোরে উঠে বউকে বল্লেন, বউ, এ কাপড়গুলি ধোপাবাড়ী পাঠিয়ে কাজ নেই, তুমি এগুলো পুকুর থেকে বেশ ক'রে ধুয়ে নিয়ে এসো। কাপড় কাচা শেষ না হ'লে বাড়ী ফিরিও না। বউ চলে গেলে পরে ব্রাহ্মণী তাড়াতাড়ি রান্না বান্না ও পিটে পায়েস তয়ের করে ব্রতের আয়োজন করতে লাগলেন।

এদিকে বউ পুকুর ঘাটে সারাদিন খেটে তেল কালীর দাগ কিছুতেই উঠাতে পারলেন না। খিদেয় তাঁর প্রাণ যেন বেরিয়ে যেতে লাগলো। তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়েছে। পাড়ার গেরস্ত মেয়েদের উলু (কেহ 'জয়কার' বা 'জোকার' শব্দ ব্যবহার করেন।) শুনতে পেয়ে তাঁর হঠাৎ মনে পড়লো, ওই যাঃ! আজ তো পাটাই ব্রত ; ঘরে কত পিটে পায়েস হয়েছে, তা ফেলে

আমি এখনো উপোস ক'রে আছি! অমনি ঘাটে কাপড় ফেলে তিনি বাড়ী ছুটলেন। খাবার লোভে তাঁর নোলায় জল সরতে লাগলো। রাস্তার ধারে বেণাঘাসের ঝোপ ছিল। তার ধারাল পাতায় সাড়ী আটকিয়ে বউ হঠাৎ পড়ে গেলেন। তাঁর মুখ থেকে আড়াই হাত লম্বা জিভ বেরিয়ে বেণাঘাসে জড়িয়ে গেল। তিনি বেহুস হয়ে পড়ে রইলেন।

ব্রত শেষ ক'রে ব্রাহ্মণী বৌয়ের দুর্গতির খবর পেয়ে দৌড়ে এলেন। পূজার ফুল দুর্ব্বা ও জলের ছিটা পেয়ে বউ উদ্ধার হলেন। তাঁর প্রকৃত চৈতন্য হলো। সেই দিন থেকে ব্রত উপবাস শিক্ষা করলেন। পাটাই দেবীর কৃপায় ছেলেপুলে হলো, ষষ্ঠী ঠাকুরুণের কোপ গেল। ব্রাহ্মণী বউ নিয়ে সুখে ঘর কন্না করতে লাগলেন।

'প্রণাম। সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোস্তুতে॥

সমাপ্ত